বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ
১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

এম. ফিল. ডিগ্রী কার্যক্রমের আংশিক পরিপূরক গবেষণা পত্র

গবেষক
রাখী বর্মণ
এম. ফিল. রেজিস্ট্রেশন নম্বর - ১১৪
শিক্ষাবর্ষ ঃ ১৯৯৯-২০০০

448916

Dhaka University Library
448916

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
জুন, ২০০৮।

উৎসর্গ

চিরনিদ্রায় শায়িত মমতাময়ী

'মা'-কে

অতি শৈশব থেকেই যার স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে আমি বঞ্চিত

৫৫৪৭১৬

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রাখী বর্মণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়য় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা" শীষর্ক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেন নি। এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয় নি।

৫৫৪৭১৩

তারিখ ঃ June 30, 2008
ঢাকা

(ড. এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

গবেষণা একটি জটিল ও রোমাঞ্চকর কাজ। ছাত্র জীবনের এক পরিণত পর্যায়ে এমন একটি মহিমান্বিত কর্মপ্রয়াসও সহজে সবার জীবনে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এমন একটি অনুসন্ধিৎসার সুযোগ পেয়ে এবং দীর্ঘদিন গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সুখী অনুভব করছি। সম্ভবত যে সমস্ত কাজে অত্যন্ত নিবেদিত ও একনিষ্ঠভাবে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সুনির্দিষ্ট একটি পদ্ধতির আশ্রয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হয় গবেষণা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ সুশীল গণতন্ত্রের পথ পরিক্রমায় এখনও শিশু। কারণ গণতন্ত্রের দুর্গম যাত্রা পথে বিশ্ব মানচিত্রে অপেক্ষাকৃত নতুন এ দেশটির অভিজ্ঞতা ও চর্চা খুবই সামান্য। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও তার সুফল প্রাপ্তির জন্য এখনো অনেক পথই পাড়ি দেয়ার বাকি। তবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে একটি যুগান্তকারী সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাই গবেষণার ন্যায় এমন একটি দুঃসাহসিক অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে আমি সমসাময়িক, অতি আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"-কে বেছে নিয়েছি।

গবেষণা কর্মটির বিষয় নির্বাচনে যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন, তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ। এমন একটি যুগোপযোগী ও বহুল কাঙ্ক্ষিত বিষয় চয়নে সহযোগিতা পেয়ে আমি তার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে এ পর্যায়ে শ্রদ্ধাভরে যাকে স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাহায্য সহযোগিতা, মূল্যবান উপদেশ, গঠনমূলক ও অত্যাবশ্যকীয় পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা আমার এ গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। তাঁর অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। অভাবনীয় ব্যস্ততার মাঝেও খন্ড খণ্ড সময় ও দুর্মূল্য পরামর্শ এবং বিভিন্ন ধরনের সগযোগিতা দিয়ে যিনি আমাকে চির ঋণী করেছেন সেই ড. আতাউর রহমান স্যারকে এ প্রসঙ্গে আমি অবণত মস্তকে স্মরণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি অত্র বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া স্যারকে, যিনি এ গবেষণায় তো বটেই এমনকি এর বাইরেও আমার লেখনি কর্মের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সর্বত সহযোগিতার হাত অবারিত রেখেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি যাদের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আজকের এ গবেষণা কর্মটির সমাপ্তি লগ্নে উপনীত হতে পেরেছি, তারা হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী। যাদের একান্ত সহযোগিতা আমার এ গবেষাণাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছে সেই বিভাগীয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ না জানালে আমি নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে থাকব।

পরিশেষে যেটা না বললেই নয়, সেটা হলো- গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, বিজ্ঞজনদের সাথে আলাপ পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন ইত্যাদি কাজে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করলেও অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত কম্পোজ করে তা পূর্ণাঙ্গ অভিসন্দর্ভের আকারে উপস্থাপনে এর আঙ্গিক ও বর্ণবিন্যাসে কিছু ছোট খাটো ত্রুটি-বিচ্যূতি থেকে যাবে, এর জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাইছি। তবে এতদস্বত্ত্বেও যদি আমার এ সামান্য প্রয়াস কারো বিন্দুমাত্র কাজে আসতে পারে তাহলেই আমি আমার স্বার্থকতা খুঁজে পাব।

রাখী বর্মন
৩০-০৬-২০০৮

(রাখী বর্মণ)
এম. ফিল. গবেষক
এম. ফিল. রেজিস্ট্রেশন নম্বর - ১১৪
শিক্ষাবর্ষ ঃ ১৯৯৯-২০০০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা		১-১৫
১.১	গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ	৪
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা	৬
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	৬
১.৪	গবেষণার প্রশ্নপত্র	৮
১.৫	গবেষণার পরিসর	৯
১.৬	গবেষণার অধ্যায়ভিত্তিক সারাংশ	১০
১.৭	গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ পদ্ধতি	১২
১.৮	গবেষণার কৌশল	১৪
১.৯	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক পটভূমি ও ধারণাগত কাঠামো		১৬-৫৩
২.১	বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা	১৭
২.২	গণতন্ত্র	১৯
২.৩	নির্বাচন	২০
২.৪	নিরপেক্ষ নির্বাচন	২২
২.৫	নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্তরায়সমূহ	২৩
২.৬	নির্বাচন ও গণতন্ত্র	২৪
২.৭	নির্বাচন পদ্ধতি	২৮
২.৮	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ	২৯
২.৮.১	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংজ্ঞা	২৯
২.৮.২	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈশিষ্ট্য	৩০
২.৮.৩	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দোষ-গুণ	৩১
২.৯	বিভিন্ন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার	৩৩
২.৯.১	ইংল্যান্ড ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার	৩৩

Dhaka University Institutional Repository

২.৯.২ ভারত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩৫
২.৯.৩ পাকিস্তান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩৭
২.৯.৪ নেপাল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩৮
২.৯.৫ অস্ট্রেলিয়া ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩৯
২.১০ বাংলাদেশ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৪০
২.১১ বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি (১৯৯০-৯৬) ৪১
২.১১.১ ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি ৪২
২.১১.২ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়া ৫৪-৬৯
৩.১ ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৫৫
৩.১.১ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ৫৫
৩.১.২ ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৫৮
৩.২ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৫৯
৩.২.১ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ৬০
৩.২.২ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ৬২
৩.২.৩ ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৬৫
৩.২.৪ ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব ৬৫
৩.৩ ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৭০-৮০
৪.১ গণতন্ত্রায়ন ৭১
৪.২ গণতন্ত্রায়নের উপাদান ৭২
৭.৩ গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৭৪
৭.৪ বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচন ও বাংলাদেশ ৮১-৯৮

৫.১ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ৮২

৫.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহ (১৯৭৩ - ১৯৯৬) ৮৫

৫.২.১ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৬

৫.২.২ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৭

৫.২.৩ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৭

৫.২.৪ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৮

৫.২.৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৮

৫.২.৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৯

৫.২.৭ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৯

৫.৩ বাংলাদেশে দলীয় সরকার ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা (১৯৭৩-৯৬) ৯০

৫.৩.১ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সাংসদ ৯২

৫.৩.২ আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা ৯৩

৫.৩.৩ নির্বাচন বর্জন ৯৪

৫.৩.৪ ভোটকেন্দ্র সংখ্যা ৯৫

৫.৩.৫ নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক দল ও জোট ৯৬

৫.৩.৬ নির্বাচনে মোট ভোটার ও প্রদত্ত ভোটের হার ৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক ৯৯-১১৯

৬.১. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯৯

৬.১.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক রূপ ১০০

৬.১.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ক্ষমতা ১০৩

৬.২ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ঃ একটি বিতর্কিত পর্যালোচনা ১০৫

৬.২.১ ত্রয়োদশ সংশোধনী এবং শব্দ ও বাক্য বিভ্রাট ১১১

৬.২.২ গণভোট ও ত্রয়োদশ সংশোধনী ১১৪

৬.২.৩ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিধি ১১৫

৬.৩ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

জনমত জরিপ ও সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ১২০-১৫৪

৭.১ উত্তরদাতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী ১২০

৭.২ সাধারণ জনগণের মতামত ১২৩

৭.৩ সংবিধান বা আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার ১৩৩

৭.৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার ১৩৭

৭.৫ উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার ১৪২

৭.৬ রাজনীতিবিদ, সাংসদ ও মন্ত্রীদের সাক্ষাৎকার ১৪৬

৭.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ১৫০

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার ১৫৫

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ১৫৮

দলিলাদি ১৬৩

দৈনিক পত্রিকাসমূহ ১৬৪

সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ ১৬৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ ঃ জনসাধারণের মতামত জরিপ প্রশ্নপত্র ১৬৬

পরিশিষ্ট-২ ঃ সংবিধান বা আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার ১৬৮

পরিশিষ্ট-৩ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার ১৬৯

পরিশিষ্ট-৪ ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার ১৭০

পরিশিষ্ট-৫ ঃ মন্ত্রিপরিষদ সদস্য বা সাংসদ বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ১৭১

পরিশিষ্ট-৬ ঃ স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ১৭২

পরিশিষ্ট-৭ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ১৭৩

পরিশিষ্ট-৮ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

৫.১	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহ (১৯৭৩ - ১৯৯৬)	৮৬
৫.২	বাংলাদেশে দলীয় সরকার ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা (১৯৭৩-৯৬)	৯২
৫.৩	আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা	৯৪
৫.৪	আসন প্রতি ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	৯৫
৫.৫	নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক দল ও জোট সংখ্যা	৯৬
৫.৬	নির্বাচনে মোট ভোটার ও প্রদত্ত ভোটের হার	৯৭
৭.১	উত্তরদাতাদের বয়সসীমা	১২১
৭.২	পেশা অনুযায়ী উত্তরদাতা	১২২
৭.৩	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১২৩
৭.৪	নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধাসমূহ	১২৪
৭.৫	সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে জরুরি বিষয়সমূহ	১২৪
৭.৬	নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব	১২৫
৭.৭	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভোটদানের উপর প্রভাব	১২৬
৭.৮	ভোটপ্রদানে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ	১২৬
৭.৯	নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রধান কারণ	১২৭
৭.১০	তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে যে নির্বাচন হওয়া উচিত	১২৮
৭.১১	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা	১৩০
৭.১২	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ	১৩০
৭.১৩	১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষমতা	১৩১
৭.১৪	দেশের সার্বিক পরিস্থিতি	১৩১
৭.১৫	আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	১৩২
৭.১৬	নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা	১৩২
৭.১৭	পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা	১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা
Introduction

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন।[১] রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতেও এটি এক নতুন সংযোজন।[২] বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গণতন্ত্র এর শাসন প্রক্রিয়ার অন্যতম মৌলিক নীতি। সে হিসেবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো নির্বাচন ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতির অন্যতম 'গণতন্ত্র' সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নির্বাচন একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশবাসী রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। তবে কথা থাকে যে, সে নির্বাচন হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। কেননা এরূপ নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে পারেন। কোন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। ত্রয়োদশ সংশোধনী কার্যকর হবার আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো বিধান ছিলো না। রাষ্ট্র পরিচালনার দিকদর্শনেও এর কোনো আভাস দেয়া হয় নি। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি একটি নতুন রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে আবেগ সৃষ্টি করে।[৩]

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৪] এ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে দেশ প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সুশাসন (Democratic

---

১. বিচারপতি লতিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা, জুলাই, ২০০২, ঢাকা, পৃঃ ৭৬-৭৭।

২. তারেক এম. টি. রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৪১।

৩. মাহমুদ শফিক, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অনন্যা প্রকাশনা, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৯৬, পৃঃ ৪৭।

৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

Governance)-এর পথে পরিচালিত হতে থাকে। বিশেষ করে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী আইন পাসের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সংবিধানের 'একাদশ সংশোধনী'র মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদের উপ-রাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ এবং উপরোক্ত সময়ে কৃত এবং গৃহীত কাজকর্ম বৈধ বলে স্বীকৃত হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে পুনরায় স্বপদে ফিরে যাবার পথ প্রশস্ত করা হয়। আর সংবিধানের 'দ্বাদশ সংশোধনী'র মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছর পরে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

তবে বাংলাদেশের ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি আমরা দেখতে পাই ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে। আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য শরিক দল ক্ষমতাসীন বি. এন. পি.-কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে দাবি করে। কিন্তু রক্ষনশীল বি. এন. পি. সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টিকে প্রথমে অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে সরকারি দল ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিরোধী দলসমূহের টানা দুই বছরের আন্দোলনের মুখে সংবিধানের 'ত্রয়োদশ সংশোধনী'র মাধ্যমে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাশ করে। এ বিলটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল' হিসেবেই বেশি পরিচিত।[৫]

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন নজির সৃষ্টি হল এবং একটি নতুন ধারণা যুক্ত হল।[৬] ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে দ্বিতীয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এ সরকারের অধীনেই ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয়

৫. দৈনিক সংবাদ, ২৭ মার্চ, ১৯৯৬।
৪. তারেক এম. টি. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৭] আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (Al Masud Hasanuzzaman) বলেছেন, "The neutral caretaker government of Bangladesh has been the products of intense opposition movement centering on the forceful demand for free and fair general polls. By legalizing caretaker government through Thirteenth Amendment to the Constitution in 1996, Bangladesh has founded a unique example in the existing parliamentary systems."[৮]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি স্বীকৃত মডেল হচ্ছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। বাঙালি জাতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এ ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুকূল একটি আয়োজন। জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজে আজকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ। ইতিহাস আমাদের সুযোগ দিয়েছে এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের যা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করবে, আলোচনা এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ জাতির, পরিবেশ সৃষ্টি হলেও, এখানে জাগ্রত হয় নি জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক চেতনা। যার ফলে গণতান্ত্রিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালের সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

তাই আলোচ্য গবেষণা প্রস্তাবনাটির শিরোনাম নির্ধারণ করেছি - "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"। চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সময়ের দাবি ও জনগণের আশা-আকাংঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত বিষয়টি সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা কর্ম হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধানের দাবি রাখে। এ দাবি ও গুরুত্বকে সামনে রেখেই বিষয়টি আমি এম.ফিল. গবেষণার অভিসন্দর্ভ হিসেবে গ্রহন করেছি। প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিভিত্তিক এবং তত্ত্বকেন্দ্রিক, বিশ্লেষণধর্মী, তথ্যবহুল, প্রমাণসাপেক্ষ ও বর্ণনামূলক অবয়ব প্রদান করা হয়েছে।

---

৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ জুন, ১৯৯৬।

৮. Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, University Press Limited, 1998.

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণার উপর বেশ কিছু পুস্তক, জার্নাল এবং প্রবন্ধ হিসেবে কিছু লেখালিখি হলেও এ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল, রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আজ পর্যন্ত তেমন বেশী হয় নি। তাই আমি গবেষণার বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করে এর সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নতকরণে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকার মূল্যায়ন করেছি।

১.১ গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ
Title of the Research and Cruse of the Problem

গবেষণার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Research'। 'Research' শব্দের অর্থ হলো পুনঃঅনুসন্ধান। অন্যভাবে বলা যায় যে, গবেষণা হলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কিছুর সংযোজন (something addition to knowledge)। আর নতুন কিছুর সংযোজনের জন্য প্রয়োজন অনুসন্ধান করা। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে একদিকে যেমন নতুন তথ্য আবিষ্কার হয়, তেমনি পুরনো তথ্য ভুল প্রমানিত হয়। অর্থাৎ কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অধিকতর সমৃদ্ধ, সুসংহত, নির্ভরযোগ্য ও যৌক্তিক জ্ঞান লাভের জন্য সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান দরকার। আর এ ধরনের অনুসন্ধান গবেষণা নামে পরিচিত। প্রচলিত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই ও নতুন জ্ঞান আহরণ করতে যখন সুসংঘবদ্ধ কর্মতৎপরতা বা কর্মপদ্ধতির অনুসরণ হয়, তখন তাকে গবেষণা বলে।

মেরী ই. ম্যাকডোনাল্ড (Marry E. Macdonald) বলেন, "Research may be defined as systematic investigation intended to add to available knowledge in a form that is communicable and verifiable." অর্থাৎ বোধগম্য ও যাচাইযোগ্য জ্ঞান দ্বারা প্রচলিত জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করার সুশৃঙ্খল অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা হয়।[৯]

রবার্ট রস (Robert Ross) - এর মতে, "Research is essentially an investigation, a recording and an analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge." অর্থাৎ গবেষণা হলো মূলত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান, একটি সমস্যা কেন্দ্রীক অনুসন্ধান।[১০]

---

৯. Marry E. Macdonald , Social Work Research : A Perspective, Norman A. Polanasky (ed.), 1960, P.

১০. Robert Ross, Research : An Introduction, Cha. 1, P. 4.

Dhaka University Institutional Repository

কোন গবেষণার প্রাথমিক ও মৌলিক কাজ হলো গবেষণার শিরোনাম ঠিক করে এর বিষয়বস্তু বা সমস্যা নির্বাচন করা এবং এর বিস্তারিত বর্ণনা বা বিবরণ দেয়া। প্রকৃতপক্ষে কোন একটি সমস্যা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবনা এবং সুতীব্র সচেতনতাই হচ্ছে গবেষণার প্রধান বিষয়। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যা অনুসন্ধানের বিষয় বা যে বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে হয় সেটিই হচ্ছে সমস্যা। সাধারণত গবেষক সমস্যার ব্যাপকতা, অনুসন্ধান চালানোর সামর্থ্য ও গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন সমস্যার মধ্য হতে গবেষণার সমস্যা বা বিষয় নির্বাচন করে থাকেন।

আলোচ্য গবেষণার প্রস্তাবিত শিরোনাম "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"- এর উপর ভিত্তি করে উক্ত গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা বিরাজমান তার বিভিন্ন দিক উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। জেনারেল এরশাদের পতনের পর রাজনৈতিক জোট ও জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ১৯৯০ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার । কিন্তু এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ছিল সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। তারপরেও বলতে হয় এটা ছিল জনগণের আশা আকাঙ্খা ও বিরোধী জোটের স্বপ্নের প্রতিফলন। তাই সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বৈধতা দেয়া হয়।[১১] তবে আমরা সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সন্ধান পাই বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে । তৎকালীন বি. এন. পি. সরকার ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ ব্যবস্থা শুধু জাতীয়ভাবেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত ও বহুল প্রশংসিত।[১২]

তাই বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সে জন্য আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের বিগত বছর গুলোর গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরূপ, গতি-প্রকৃতি উদঘাটন করে তার ভিত্তিতে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য গবেষণায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গণতান্ত্রিক ভূমিকার উপর বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রস্তাবিত শিরোনামের নামকরণ স্বার্থক হয়েছে।

---

১১. জনকণ্ঠ পাক্ষিক, সংখ্যা-২১, ২২ এপ্রিল থেকে ৬ মে, ২০০১, ঢাকা, পৃঃ ৯-১৩।
১২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা
Justification of the Research

গবেষণার যৌক্তিকতা গবেষণা সমস্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে গবেষক যুক্তিসহকারে তার গবেষণার বিশেষ প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ গবেষক গবেষণালব্দজ্ঞান জ্ঞানের বিস্তারে সহায়তা করবে, অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সমাধানে কাজে লাগবে কিংবা কোন উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহনে ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। এক কথায় গবেষণার যৌক্তিক দিকগুলো যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে বা বিষয়টির যৌক্তিকতা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

আলোচ্য গবেষণা প্রস্তাবনা "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"- এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি কি ভূমিকা পালন করেছিল - এ প্রশ্নটিকে গবেষণা সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর যৌক্তিকতা নির্ধারণের মানদন্ডে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি রচিত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন (Criminalization of Politics) সম্পন্ন হয় এবং ফলে ক্ষমতাসীনদের হাতে নির্বাচন যেভাবে অর্থহীন হয়ে উঠে, সেই প্রেক্ষিতেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা অনুধাবনযোগ্য।[১৩] তাই গণতন্ত্র প্রত্যাশী জনগণের দীর্ঘ দিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়টির যৌক্তিকতা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য
Objectives of the Research

গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু ও পদ্ধতিনিষ্ঠ উপায়ে সত্যকে উদঘাটন করা। আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করার জন্যই গবেষণা কর্ম গৃহীত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্যগতভাবে যে কোন গবেষণাই নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উপস্থিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে তথা তত্ত্ব গঠনে আগ্রহী। তাই গবেষণা হলো জ্ঞান অনুসন্ধানের

---

১৩. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির গতিধারা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের সমস্যাবলী, ঝিনুক প্রকাশ, ২০০২, পৃঃ ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শায়িত বা মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ, সুসংগঠিত জ্ঞানের আবিষ্কার ও বিকাশের লক্ষ্যে নিবেদিত পদ্ধতিগত কর্মকান্ড।

গবেষণা সবসময় কোন না কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিবেদিত। এর জন্য প্রয়োজন নির্ভুল পর্যবেক্ষণ, সঠিক বর্ণনা, কুশলী ও পদ্ধতিগত অনুসন্ধান। মোটকথা কোন একটি বিষয়ে সমস্যা সমাধানের স্বার্থে বিশেষ পদ্ধতিতে এর যৌক্তিক উত্তর খুঁজে বের করে সমস্যাটির সমাধানের পথ খুঁজে বের করাই হচ্ছে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। গবেষক কি উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য গবেষণা কর্ম পরিচালনা করছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণকে গবেষণা কর্মের 'কার্যগত নির্দেশনা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আলোচ্য গবেষণা প্রস্তাবনাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে - ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করতে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে সমস্ত সমস্যা বা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে তার উত্তর বা সমাধান খুঁজে বের করা এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌছানো। এ ছাড়া মূখ্য উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আরো কিছু অপ্রধান উদ্দেশ্যও রয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভটির উদ্দেশ্যের বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রকৃতি নির্ণয়।
২. সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিরূপন।
৩. সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা।
৪. দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ।
৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গ্রহনযোগ্যতা নির্ধারণ।
৬. সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে উদ্ভূত বিতর্ক পর্যালোচনা।
৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আরও ফলপ্রসূ করার উপায় নির্ধারণ।
৮. নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য নিরূপণ।
৯. গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়।
১০. বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকারিতা নির্ধারণ।
১১. বাংলাদেশে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনসমূহ পর্যালোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

১২. বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নির্ণয়।

উপর্যুক্ত এ সকল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় - "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা" শীর্ষক এ গবেষণাটি এক শেকড় সন্ধানী গবেষণা।

১.৪ গবেষণার প্রশ্নপত্র

Questionnaire of the Research

গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নমালা প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, অনুমান যাচাইয়ের সহায়ক বা গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম এরূপ চলকগুলোকে কতিপয় লিখিত প্রশ্নের আকারে উপস্থাপন করা হয়। এরূপ প্রশ্নাবলী, প্রদত্ত উত্তরসমুহ এবং সংযুক্ত নির্দেশনাকে সমষ্টিগতভাবে গবেষণার প্রশ্নপত্র বলা হয়। গবেষণার প্রশ্নগুলো গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী থেকে উদ্ভব হয়। অর্থাৎ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলীকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্নে রূপান্তর করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সমস্যার সমাধান কল্পে এবং বাস্ত ব পরিস্থিতি অনুসন্ধানে কয়েকটি গবেষণা প্রশ্ন প্রণীত হয়।

আলোচ্য গবেষণা প্রস্তাবনা "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"- এর উদ্দেশ্যসমূহ প্রশ্নে রূপান্তর করে সুষ্ঠুভাবে সুনির্দিষ্ট উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নমালার আলোকে পরিচালিত হয়েছে ঃ

১. বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণ কি?
২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কি সর্বোত্তম ব্যবস্থা?
৩. বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনে কোনরূপ আবশ্যকীয়তা রয়েছে কি?
৪. সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন কতটুকু গণতন্ত্র সম্মত?

Dhaka University Institutional Repository

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে?

৬. উন্নত দেশে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব হলেও বাংলাদেশে নয় কেন?

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণা কি সংবিধান পরিপন্থী?

৮. দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহে কি কি পরিবর্তন চোখে পড়ে?

৯. সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না স্বাধীন নির্বাচন কমিশন- কোনটি বেশী প্রয়োজন?

১০. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা কতটুকু?

১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌল নীতি '১১ নং অনুচ্ছেদ'-এর সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ?

১২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা কি কি?

১৩. সুষ্ঠু নির্বাচন আয়েজনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কিছু হতে পারে কি?

১৪. ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সমুন্নতকরণে কি ভূমিকা পালন করেছিল?

১.৫ গবেষণার পরিসর
Scope of the Research

কোন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে বিষয়টির অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিসর বা আওতা থাকা বাঞ্চণীয়। অর্থাৎ কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত করতে গবেষককে নির্ধারিত পরিসরের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। যে শিরোনামে গবেষণাটি করা হয়, সেটিই এখানে মূখ্য আলোচ্য বিষয়।

আলোচ্য গবেষণাটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিকের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার জন্ম থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃত দিক নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে গবেষণার প্রস্তাবিত

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে এ সরকারের ভূমিকার উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও গবেষণার স্বার্থে আলোচনা করা হয়েছে। তাই গবেষণার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য নির্ধারিত পরিসরের বাইরে গিয়েও কাজ করতে হয়েছে। তবে তাতে করে গবেষণা প্রস্তাবনাটির গুরুত্ব কোনভাবেই কমে যায়নি।

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী শ্রেণী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাগণ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎকার ও জনসাধারণের মতামতকে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার অধ্যায়ভিত্তিক সারাংশ
Statement of Chapters of the Research

যে কোন গবেষণা কর্ম কয়েকটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে গবেষণার পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা মেনে চলা হয়। গবেষক একটি সুশৃঙ্খল কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে গবেষণার অধ্যায়সমূহ সুনির্দিষ্ট অধ্যায়ভিত্তিক শিরোনামের আলোকে বর্ণনা করেন এবং অধ্যায়সমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেন। আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার অধ্যায়ভিত্তিক সারাংশ নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা প্রকল্পটির ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে 'ভূমিকার' মাধ্যমে গবেষণার মূল সমস্যা ও উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গবেষণার যৌক্তিক বিষয়গুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য গবেষণার কিছু প্রশ্ন নির্ধারণ করে এগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া এ অধ্যায়ে গবেষণার মূল শিরোনামকে চিহ্নিত করে একটি রূপরেখা ও সমস্যাকে সমাধানের জন্যে পদ্ধতিগত কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কৌশল সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতাও উক্ত গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার তাত্ত্বিক দিক আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্র, নির্বাচন ও গবেষণার মূল শিরোনাম সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর যথাযথ এবং

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পটভূমির উপর বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর একটি তুলনামূলক আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ চতুর্থ অধ্যায় আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা গবেষণাটির শিরোনামের উপর অধিক আলোকপাত করে। এ অধ্যায়ে গণতন্ত্রায়নের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ পঞ্চম অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনের উপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী এখানে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন নির্বাচনী তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরূপ, গঠন, কার্যাবলী, সাংবিধানিক ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোনীর উপর একটি বিতর্কমূলক পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এখানে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি পূরণের নিমিত্তে জনমত জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ঃ অষ্টম তথা সর্বশেষ অধ্যায়ে বিশেষত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর বিস্তারিত আলোচনার সার সংক্ষেপ অর্থাৎ গবেষণার উপসংহার স্থান পেয়েছে, যা আলোচ্য গবেষণার মূল বক্তব্যটির গভীরতা স্পষ্ট করবে।

১.৭ গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ পদ্ধতি
Method of Data Collection of the Research

গবেষণা কর্ম যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ বা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দু'ধরনের উৎসের উপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। (ক) প্রাথমিক উৎস এবং (খ) মাধ্যমিক উৎস । মাধ্যমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের বই, বিভিন্ন সাময়িক পত্র, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন গবেষকের গবেষণা কর্ম, ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ। আর প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ও তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন এবং নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরির মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত জরিপ।

আলোচ্য গবেষণা প্রস্তাবনা "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"- এ বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় উৎসই ব্যবহার করেছি ঃ

(ক) প্রাথমিক উৎস (Primary Source) ঃ

বর্ণনামূলক গবেষণায় সর্বাধিক ব্যবহৃত উপকরণ হলো এ গবেষণা উপকরণ অর্থাৎ প্রাথমিক উৎস। প্রাথমিক উৎস হিসেবে আমি একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করেছি। এ ক্ষেত্রে মতামত জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করে প্রশ্নমালা অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য উপাত্তসমূহ সমন্বিত করেছি এবং তা প্রয়োজনীয় স্থানে যথাযথভাবে সংযোজিত করেছি। আলোচ্য গবেষণায় সর্বমোট ছয়টি প্রশ্নমালা তৈরির মাধ্যমে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। যেমন –

১। **জনসাধারণের মতামত জরিপ** ঃ জনসাধারণের মতামত জরিপের অংশ হিসেবে ২০০ জন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ জনতার নিকট হতে নির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমানগত - উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২। **সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার ঃ** সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারের অংশ হিসেবে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৫ জন সংবিধান বা আইন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে।

৩। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার ঃ** গবেষণা কর্মটি যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই অংশ, তাই এর সার্বিক দিক যাচাই বাছাইয়ের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বেছে নেয়া হয়েছে।

৪। **উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন তারাই উপদেষ্টা। আর গবেষণাটি যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে, তাই উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকারের অংশ হিসেবে প্রাক্তন উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের মধ্য হতে ১০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। তবে তা অবশ্যই পূর্ব নির্ধারিত একটি প্রশ্নমালার আশ্রয়ে গৃহীত হয়েছে।

৫। **রাজনীতিবিদ, সাংসদ ও মন্ত্রীদের সাক্ষাৎকার ঃ** রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রাণ। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্য হতেই সাংসদ বা মন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাদের জনপ্রিয়তার মাত্রা ও পরিমান এবং দলে ভূমিকা পালনের উপর তাদের দলীয় অবস্থান নির্ধারিত হয়। এরকম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও বিভিন্ন পর্যায়ের ১৫ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে।

৬। **স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ঃ** স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ একটি দেশের উল্লেখযোগ্য অংশ। এরা তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাই গবেষণার প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের অংশ হিসেবে পূর্ব নির্বাচিত প্রশ্নের আলোকে স্থানীয় সরকারের ১০ জন সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে।

(খ) মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) ঃ

মাধ্যমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গবেষকের গবেষণা কর্ম ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তসমূহ। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র, বই-পুস্তক ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ, বিভিন্ন জার্নাল, সংবিধান ও নির্বাচনী আইন পত্রিকা,যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে গবেষণা কার্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য সরকারি দলিলপত্র যেমনঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রদত্ত রিপোর্ট ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

১.৮ গবেষণার কৌশল
Technique of the Research

যে কোন গবেষণা প্রকল্পে গবেষকরা তথ্য অনুসন্ধান ও তথ্যের বিশ্লেষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। গবেষণার লক্ষ্য অর্জনের জন্য গবেষককে সুচিন্তিতভাবে ও যুক্তিপূর্ণভাবে গবেষণা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। বিশেষত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, অনুসন্ধান কর্ম পরিচালনা এবং অনুসন্ধানের প্রায়োগিকতা বিবেচনা করে গবেষণার কৌশল বা পদ্ধতিসমূহ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

আলোচ্য গবেষণা "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"- প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে একাধারে ঐতিহাসিক, অভিজ্ঞতামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলক গবেষণা কৌশল বা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মে প্রথমে গবেষণার শিরোনাম তথা সমস্যা নির্বাচন করা হয়েছে। পরে সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান চালানোর জন্য গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ সকল উদ্দেশ্যসমূহকে কতকগুলো গবেষণা প্রশ্নে রূপান্তর করা হয়েছে। সবশেষে গবেষণা প্রশ্নসমূহের যথার্থ উত্তর খুজে বের করার নিমিত্তে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
Limitations of the Research

মূলতঃ এম ফিল অভিসন্দর্ভের জন্য এ গবেষণা পরিচালিত হয়। সংক্ষিপ্ত সময়, সীমিত আয়োজন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কারিগরি ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা গবেষণার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত আকারে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠে না । গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলশ্রুতিতে গবেষণা কর্মটি তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠে না ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণার শিরোনাম "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"- এর উপর তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। দেশের বর্তমান সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে দেশের অনেক নেতা কর্মীই জেল হাজতে রয়েছে। ফলে গবেষণার ভি. আই. পি. গ্রুপের অনেক সদস্যের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া অনেকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজিও হয় নি। এ ছাড়াও গবেষণাটির ক্ষেত্রে আরও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল এর জন্য নির্ধারিত সময়সীমা। তাই স্বল্প সময়ের মধ্যে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে ব্যাপকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠে নি।

তাই বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন স্তরের মাত্র কিছুসংখ্যক মানুষের মধ্যে পরিচালিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে গৃহীত সাক্ষাৎকার দৃশ্যতঃ আলোচ্য গবেষণার জন্য যথেষ্ট পরিমান প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারে।

যা হোক, প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষাৎকার দাতাগণের সাথে প্রশ্নমালার মাধ্যমে আহরিত মতামত নিঃসন্দেহে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যা নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক পটভূমি ও ধারণাগত কাঠামো
Theoretical Background and Conceptual Structure

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদীয় রাজনীতিতে একটি নতুন উপাদান। সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে এ তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে একটি অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (Al Masud Hasanuzzaman) লিখেছেন, "In a parliamentary system, a caretaker or interim government administers the state after the outgoing government is dissolved and before a new one can be formed following a general election."[১] সংসদীয় শাসন কাঠামোয় মন্ত্রিসভা বিলোপের পর একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার এ অনুশীলন উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই লক্ষ্য করা যায়।[২] তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানের একটি অংশ। পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়না। বাংলাদেশই এ ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা একটি অভিনব সৃষ্টি।

বাংলাদেশে সরকার পদ্ধতি সংসদীয় গণতন্ত্র হলেও, এর মধ্যে নৈতিকতার বড়ই অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে একে অপরের প্রতি বিশ্বাসের। তাই দেখা যায়, কোন রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাস তো করেই না, বরং সুযোগ পেলে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে। আর সরকারি দলই হোক, আর বিরোধী দলই হোক - কেউ কারো প্রতি বিশ্বাস রাখেনা। যে কোন কারণকে কেন্দ্র করে একে অপরকে দোষারোপ করে। বাংলাদেশে মূলত একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সমঝোতার অভাব থেকেই উদ্ভূত। বাংলাদেশের ন্যায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতকরণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা খুবই কার্যকর।

---

১. Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, University Press Limited, 1998.
২. দৈনিক জনকণ্ঠ, সাময়িকী, বিকাশমান গণতন্ত্র এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

২.১ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

The Parliamentary Democratic Governmental System of Bangladesh

সংসদের প্রাধান্য, সংসদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ এবং জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া সংসদীয় ব্যবস্থার মর্মবাণী। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের দাবি বহুদিনের। স্বাধীনতাত্তোরকালে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। ২৪ বছরের পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অভিজ্ঞতা সৃষ্ট ঐকমত্য এবং ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ- দুইয়ের প্রভাবে প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামরত এদেশের জনমন্ডলীর ব্যাপক দাবি সমর্থনের ফলে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির নীতি গৃহীত হয়েছিল।[৩]

১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়, রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকদের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।[৪] বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি যথাঃ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা - এ নীতিসমূহ দ্বারা সংসদীয় গণতন্ত্রের চিন্তা-চেতনা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার বহিঃপ্রকাশই পরিলক্ষিত হয়।[৫]

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস করে এবং সংসদীয় সরকার পদ্ধতিকে বদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে দেশের শাসন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটায়।[৬] তবে এ ব্যবস্থা সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করে নি। তাই এর পরিবর্তে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

---

৩. ড. হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশ ১৯৮৯-রাজনীতিক সংসটের স্বরূপ ও মৌল নীতিমালার ঐকমত্য, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা-৩৪, নভেম্বর, ১৯৮৯, পৃষ্ঠাঃ ১-২১।

৪. Talukder Moniruzzaman, Radical Political and the Emergence of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh Book International Ltd., 1975, P. 34.

৫. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃষ্ঠাঃ ১৪৪।

৬. ড. হাসান উজ্জামান, ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ঃ একটি বিশ্লেষণ, আওয়ামী লীগ ও বাকশাল ১৯৭২-১৯৭৫, সিলেট, বাংলাদেশ প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃষ্ঠাঃ ৬৪-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এরপর ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকে। ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চালু থাকা রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে বেসামরিক-সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন এক ব্যক্তির ঘৃণ্য স্বেচ্ছাচার জনজীবন, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড, সাংবিধানিক ধারা এবং প্রকৃত গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত, নিগৃহীত ও নস্যাৎ করে দেয়। এ কারণে ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০-এর তিন জোটের যৌথ ঘোষণা এবং ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসনের মুখোশ আটা এক ব্যক্তির স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে এবং দাবি ওঠে সংসদের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য থাকবে এমন সরকারের তথা সংসদীয় ব্যবস্থার।[৭]

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর থেকে এ দাবি জাতীয় দাবিতে পরিণত হতে থাকে। ১৯৯১ সালের ১৪ এপ্রিল পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন বিলের নোটিশ দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ৩০ জুন সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকেও এ সম্পর্কিত আরও দুটি বিলে নোটিশ দেয়া হয়। ৪ জুলাই ওয়ার্কাস পার্টিও ৪টি বিল উত্থাপন করে। ১৯৯১ সালের ৯ জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে ৭টি বিল ১৫ সদস্যের বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়। বাছাই কমিটির সভাপতি ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। বাছাই কমিটি ২৯টি বৈঠকে প্রায় ১০০ ঘন্টা আলোচনা, পর্যালোচনার পর বিলে সর্বসম্মতি প্রদান করে। ঐ রিপোর্টের উপর আলোচনার পর একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধন আইন সংসদে গৃহীত হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট।

এক অভূতপূর্ব সৌহাদ্য, সমঝোতা এবং আনন্দঘন পরিবেশে এ সংশোধন আইন দুটি প্রণীত হয়। একাদশ সংশোধন আইনের পক্ষে ছিল ২৭৮ টি ভোট এবং দ্বাদশ সংশোধন আইনের পক্ষে ছিল ৩০৭ টি ভোট। বিপক্ষে কোন ভোট ছিল না। ডেপুটি স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী এ ঐতিহাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ৪৮ অনুচ্ছেদে দুটি সংশোধনী প্রস্তাবসহ তা গৃহীত হয়। দ্বাদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাংলাদেশে আবার প্রবর্তিত হয় সংসদীয় ব্যবস্থা। শুরু হয় গণতন্ত্রের জয়যাত্রা।

---

৭. ড. হাসান উজ্জামান, নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, অক্ষর, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ গণতন্ত্র

Democracy

বর্তমান বিশ্বে 'গণতন্ত্র' শব্দটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও আলোচিত বিষয়। এটি এমন একটি শব্দ, যা যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্র এমন একটি আদর্শ, যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শত শতাব্দী ধরে সভ্য মানব জাতি সংগ্রাম করে চলেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যদিও একটি প্রাচীনতম ধারণা, কিন্তু সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্র সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য ও প্রশংসিত শাসনব্যবস্থা।

সাধারণভাবে গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে শাসনব্যবস্থা চালানোর একটি পদ্ধতি। যে শাসনব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা এক বা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে না থেকে রাষ্ট্রের সব জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে এবং অধিকাংশ জনগণকে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়া হয়, তাকে গণতন্ত্র বলে। তবে এ নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রচলিত রয়েছে। কারো মতে, গণতন্ত্র এক প্রকার সরকার ব্যবস্থা, এক প্রকার সমাজ ব্যবস্থা এবং এক প্রকার জীবন পদ্ধতি। আবার কারো মতে, গণতন্ত্র কোন প্রকার সরকার ব্যবস্থা নয়, বরং শাসনকর্তা নির্বাচনের একটি উত্তম পদ্ধতি মাত্র।

গ্রিক পন্ডিত হিরোডোটাস (Herodotus) লিখেছেন, "গণতন্ত্র এমন এক সরকার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সমাজের সকল সদস্যের উপর ন্যস্ত থাকে।"

লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে, "Democracy is that form of government in which the ruling of a state is legally vested, not in any particular class or classes, but in the members of the community as a whole." অর্থাৎ গণতন্ত্র এমন এক ধরনের সরকার, যাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আইনগতভাবে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের হাতে নিয়োজিত না থেকে বরং সমাজের সকল সদস্যের হাতে নিয়োজিত থাকে।[৮]

অধ্যাপক আর.এম. ম্যাকাইভার (R. M. MacIver) বলেছেন, "গণতন্ত্র বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের বা অন্য কারো দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ার পদ্ধতিকে বুঝায় না; বরং প্রধানত কে বা কারা পরিচালনা করবে এবং মোটামুটিভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা নির্ধারণ করারই উপায় বিশেষ।"

---

৮. Lord Bryce, Modern democracies,Vol.1, p.20.

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) গণতন্ত্রের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করেন। তার মতে, "Democracy is a government of the people, by the people and for the people." অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।[৯]

সুতরাং গণতন্ত্রের মূলকথা হলো, 'জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী'। তাই বলা যায় যে, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের দ্বারা গঠিত একটি সরকার, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে জনগণের ওপর এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগ করছে সরাসরিভাবে জনগণ বা জনগণের প্রতিনিধিরা, যারা নির্বাচিত হয়েছেন একটি অবাধ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

২.৩ নির্বাচন
Election

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'নির্বাচন'। নির্বাচন একটি শক্তি, একটি মাধ্যম। এর কাজ হলো গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আর জনগণের এ সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই কার্যকর হয়ে থাকে। তাই নির্বাচনই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম, যেখানে জনমতের প্রতিফলন ও সন্নিবেশ আমরা দেখতে পাই। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনমত প্রকাশ পায় এবং সরকার জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী শাসন সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহন করে। জন মিল্টন (John Milton) বলেন, "সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষকে বুদ্ধি দিলেন, তখনই তিনি মানযকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দিলেন, কারণ বুদ্ধিই হলো নির্বাচন ক্ষমতা।"[১০]

'নির্বাচন' শব্দটির ব্যুপত্তিগত অর্থ হচ্ছে মনোনয়ন, বাছাই, পছন্দ বা নিজের শ্রেষ্ঠ মতকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু রাজনীতিতে নির্বাচন হলো জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বাছাই করার পদ্ধতিকে নির্বাচন বলে। অর্থাৎ সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নিশ্চিত করে। তাই বলা যায়, ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক যখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তখন তাকে নির্বাচন বলে।

---

৯. What is Democracy? United State Information Agency Publication, October, 1991, P-4.
১০. এম.সাইফুল্লাহ্ ভূঁইয়া ও মোঃ ফয়সাল, নির্বাচন ও গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক অ্যালান আর. বল (Alan R. Ball) -এর মতে, "Election are the means by which the people choose and exercise some degree of control over their representatives." অর্থাৎ নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাই এবং সে প্রতিনিধির উপর কিছুমাত্রায় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এক উপায় বিশেষ।[১১]

পেঙ্গুইনের রাজনীতি বিষয়ক অভিধানে অধ্যাপক রবার্টসন (Robertson) মন্তব্য করেছেন, " নির্বাচনী ব্যবস্থা হল প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটকে আসন বরাদ্দ বা কে বিজয়ী হয়েছে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধতি।"[১২]

নির্বাচন রাজনীতিতে অংশগ্রহনের একটি পথ বা পন্থা। অর্থাৎ নির্বাচন রাজনৈতিক অংশগ্রহনের পথ প্রস্তুত করে। নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে, যার ফলে উভয়ের মধ্যে এক পারস্পরিক চেতনার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অ্যালান আর. বল (Alan R. Ball) বলেন, "যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের একমাত্র উপায় হলো নির্বাচন।"[১৩]

তাছাড়া, রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে বিবেচিত। শাসক ও শাসন পদ্ধতির বৈধকরণের ব্যাপারে নির্বাচন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমেই বৈধ শাসক ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই অধ্যাপক অ্যালান আর. বল (Alan R. Ball) বলেছেন, "Election are primarily a means of legitimizing the right of the rulers to govern."[১৪]

সুতরাং বলা যায়, নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কোন রাষ্ট্রের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য কার্যকর পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন।

---

১১. দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান,তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টারপ্রাইজ, জুন, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭৬।

১২. Robertson David, The Penguin Dictionary of Politics, Middlesex, England, Penguin Books Ltd., 1987.

১৩. অনাদি কুমার মহাপাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ৮৫২।

১৪. অনাদি কুমার মহাপাত্র, ঐ, পৃঃ ৮৫০।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ নিরপেক্ষ নির্বাচন
Impartial Election

নির্বাচন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। তবে এ প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা অবশ্যই নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এখানে 'নির্বাচন' শব্দটির পূর্বে নতুন একটি প্রত্যয় 'নিরপেক্ষ' শব্দটি সংযোজন করে প্রতিনিধি নির্বাচনের এ ব্যবস্থাকে আরও যুক্তিনির্ভর, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক করা হয়েছে।

সাধারণ অর্থে নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে নিয়মিত, অবাধ, পক্ষপাতহীন, উত্তম, শান্তি পূর্ণ, প্রভাবমুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক, স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বুঝায়। কোন রাষ্ট্রে যখন অবাধ পরিবেশে ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, নির্ভয়ে অর্থাৎ গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে যখন ভোটদান করা হয়, সংখ্যালঘুরা তখন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্বের যখন নিশ্চয়তা বিধান করা হয়, তখন তাকে নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে। অধ্যাপক ডব্লিউ. জে. এম. ম্যাকেনজি (W. J. M. Mackenzie) বলেছেন, "Free Elections are elections in which each voter has the opportunity-an equal opportunity-to express consent in the light of his own opinions and sentiments."[১৫]

নিরপেক্ষ নির্বাচনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি অনুসৃত হয়। নিরপেক্ষ নির্বাচনে –

(১) নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কোনরূপ পক্ষ সমর্থন না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

(২) এখানে প্রশাসনযন্ত্র থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার সাথে জড়িত সকলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে।

(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিরোধী দলসহ সমগ্র নির্বাচকমন্ডলী যেন ভয়ভীতিহীনভাবে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

---

১৫. W. J. M. Mackenzie, Free Elections: An Elementary Text Book, London, 1964, p.159.

Dhaka University Institutional Repository

(৪) কালো টাকা বা পেশী শক্তি যেন কোনভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দিব'- এ শ্লোগানটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনাগুলো যে নির্বাচন ব্যবস্থায় মেনে চলা হয়, তাই নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা। নিরপেক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্র অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বশর্ত। তাই বলা যায়, নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যতীত গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়। সার্ক পর্যবেক্ষক দল বলেছেন, "Free and fair elections must form part of a process of building political institutions and a democratic culture."[১৬]

২.৫ নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্তরায়সমূহ
Obstacles of Impartial Election

নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। গণ তন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচনই একমাত্র গ্রহনযোগ্য পন্থা। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়টি এসে পড়ে। গণতন্ত্রের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। আর এ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে [১৭] –

(১) ভোটার লিষ্ট নিয়ে জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি;
(২) ভোট কেন্দ্রে অপর্যাপ্ত বুথ বিশেষ করে মহিলা বুথ;
(৩) কালো টাকার দৌরাত্ম্য তথা ভোট কেনাবেচা;
(৪) ব্যালট বাক্স ছিনতাই;
(৫) নির্বাচন কমিশনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রন;
(৬) অবৈধ অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য;
(৭) সরকারি দলের নিজের পক্ষে প্রচার কার্যের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ব্যবহার;
(৮) প্রশাসনের দলীয়করণ;
(৯) প্রচার মাধ্যম ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ব্যবহার;

---

১৬. The Bangladesh Observer, 15 June, 1996.

১৭. এম.সাইফুল্লাহ্ ভূঁইয়া ও মোঃ ফয়সাল, নির্বাচন ও গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃঃ ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) একজনের ভোট অন্যজন দেওয়া;
(১১) ভোটার আইডি কার্ডের অনুপস্থিতি;
(১২) ভোট কেন্দ্র দখল;
(১৩) পারস্পরিক অপপ্রচার;
(১৪) জোরপূর্বক ভোট দেওয়া;
(১৫) ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন;
(১৬) নির্বাচনী ফলাফল নিজের অনুকূলে আনার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্য নেওয়া;
(১৭) ধর্মকে নির্বাচনী পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা;
(১৮) ভোট গণনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

২.৬ নির্বাচন ও গণতন্ত্র
Election and Democracy

নির্বাচন ও গণতন্ত্র পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। গ্রিসের নগররাষ্ট্র থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করা গণতন্ত্র নামক ধারণাটিতে নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[১৮] নির্বাচনকে বাদ দিয়ে কখনই গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়। কেননা - "Election is the first gate of democracy". সুতরাং নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। গণতন্ত্র একটি আদর্শ যা জনগণের প্রকৃত শাসন কায়েম করে। আর এ প্রকৃত শাসন প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি হলো নিয়মিতভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ - নির্বাচনবিহীন গণতন্ত্র যেমন অর্থহীন, তেমনি গণতন্ত্রবিহীন নির্বাচন পঙ্গু। এ যেন মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। অর্থাৎ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রাচীনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। স্বল্প জনসংখ্যার মধ্যে সকলের নাগরিকত্ব ছিলনা। তাই সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নগররাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহন করতে পারত। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যা বিপুল। এখন আর জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসনকাজে অংশগ্রহন করা সম্ভব নয়। বর্তমানের বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশ লোকেরই ভোটাধিকার রয়েছে। আধুনিক

---

১৮. George H. Sabine, A History of Political Theory, New York, 1958.

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেন, "It is a form of government where ... the whole people or some numerous portion of them exercise the governing power through deputies, periodically elected by themselves."

তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ পরোক্ষভাবে ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে আইনসভার প্রতিনিধি ও শাসন কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন করে ও শাসন কার্য পরিচালনা করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর শাসনব্যবস্থার উৎকৃষ্টতা ও সফলতা নির্ভর করে। তাই যোগ্য, সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য বর্তমানে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণ এ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছে। লাভ করেছে নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় বৈজয়ন্তী জনগণের প্রতিনিধিদের দাবি এবং স্বীকৃতিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[১৯] বর্তমানের গণতন্ত্র যেহেতু পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, আর তাই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন পরিনত হয়েছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে। গণতন্ত্রের এ অগ্রগতি প্রতিনিধিত্বের ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনি জনগণকে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল আধারে পরিনত করেছে। অর্থাৎ গণতন্ত্রে জনগণই সকল সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। আর জনগণের এ সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই কার্যকর হয়ে থাকে।

গণতন্ত্র বিকাশে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্র মোটামুটি প্রতিষ্ঠা না পেলে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অগণতান্ত্রিকতার সংক্রমনে অসুস্থ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র পদ প্রদর্শক, রাষ্ট্র বিপথগামী হলে জনজীবনের সকল ক্ষেত্র দিক নির্দেশনার অভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। একটি সফল নির্বাচন একটি রাষ্ট্রের জন্য দিক নির্দেশনার সুযোগ এনে দেয়।[২০] নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের হাতিয়ার বা বাহন।

---

১৯. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তি ঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, জুন-২০০২, পৃঃ ৭১০।

২০. দৈনিক সংবাদ, ৫ মে, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাবেক স্পীকার লর্ড ওয়েদারিল দক্ষিন আফ্রিকায় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসেবে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অফিসে একটি পোষ্টার দেখতে পান। পোষ্টারে লেখা ছিল –

"আমি ক্ষুধায় কাতর ছিলাম এবং তোমরা আমার ক্ষুধার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলে।
আমি গৃহহীন ছিলাম এবং তোমরা আমার দুর্দশার ওপর একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলে।
আমি পীড়িত ছিলাম এবং তোমরা বঞ্চিতদের অবস্থা নিয়ে একটি সেমিনার করেছিলে।
তোমরা আমার সবগুলো কষ্টেরই তদন্ত করেছো কিন্তু আমি আজও ক্ষুধার্ত, গৃহহীন এবং পীড়িত।"[২১]

আসলে পোষ্টারে লেখা কথাগুলো ছিল একটি অভিযোগ – গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের যে ব্যবস্থা রয়েছে প্রথমেই তার দিকে তাকাতে হবে। দেখতে হবে তা অবাধ কিনা। কেননা রাজনৈতিক দলগুলোই অংশগ্রহন করে থাকে। আর সংসদ নির্বাচনে বেশিরভাগ প্রার্থী কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। তবে এটাও নিশ্চিত করা দরকার যে, নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহন করতে পারে। এজন্য গণতন্ত্র অর্জনের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থা কতখানি গণতান্ত্রিক তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে - এ অবাধ রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো একটি কার্যকর সংসদ, যা আইনসভা নামেও পরিচিত। এ আইনসভার সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জনগণের ভোটের অধিকার হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদান। কেননা গণতন্ত্রে বুলেটের চেয়ে ব্যালটকে বেশী মূল্যায়ন করা হয়। ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক বা নির্বাচকমন্ডলীই ব্যালটের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে বা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে। তাই দক্ষ সরকার গঠন করে সুষ্ঠুভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার গুরুদায়িত্ব আজ নির্বাচকমন্ডলীর উপর ন্যস্ত। সুতরাং

---

২১. শফিক রেহমান, গণতন্ত্র, জানুয়ারি-১৯৯৯, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচকমন্ডলীকে আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি বলা যেতে পারে। উইলোবি (Willoughby) বলেছেন, "নির্বাচকমন্ডলী হলো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি।" তিনি নির্বাচকমন্ডলীকে সরকারের চতুর্থ অঙ্গ (Fourth Branch) হিসেবে গণ্য করেছেন।[২২] আবার অধ্যাপক গেটেল (Gettell) বলেন, "Because of the wide powers, direct and indirect, exercised by the voters in the moderns status, the electorate has become practically a separate and important branch of government." তাই বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমন্ডলীকে সরকারের একটি স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত প্রভাবশালী শাখা বলা হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প কিছু নেই।

গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বে এ পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য উপায় হচ্ছে নিয়মত নির্বাচন। তবে নির্বাচন গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বশর্ত - সেটা অনস্বীকার্য। কিন্তু এটা হচ্ছে একটা লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় মাত্র। অর্থাৎ নিয়মিত নির্বাচন হওয়া মানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া নয়। কেননা নির্বাচনের মাধ্যমে যে লক্ষ্যটা অর্জনের চেষ্টা করা হয়, তা হলো সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নিশ্চিত করে। নির্বাচন মানেই গণজোয়ার। নির্বাচন মানেই ভোটযুদ্ধ। জয় পরাজয়ের খেলা। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বিত্তশালী, নিঃস্ব, অভিজাত-নিম্নবর্ণ, মন্ত্রী, পিয়ন, আমলা-কামলা সব একাকার হয়ে যায়। শহর আর গ্রামের মধ্যে সুসম্পর্কের সৃষ্টি হয়। কমে আসে দুরত্ব। নির্বাচনী মূল্যবোধের অবক্ষয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও কার্যকারিতা হারায়। মনের বিকৃতি ঘটলে দৈহিক সক্ষমতা যেমন অসামাজিক কাজের উপযোগী হয়, তেমনি নির্বাচনী মূল্যবোধের বিকৃতির ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক পরিবেশও হয়ে উঠে স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী, অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের দোসর। তাই বলা যায়, সমাজে গণতন্ত্রের সৌধকে সমুন্নত রাখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নির্বাচনী মূল্যবোধের ব্যাপক চর্চা।

---

২২. W. F.Willoughby, Government of the Modern States.

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ নির্বাচন পদ্ধতি
Modes of Election

যে পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হয় তাকে নির্বাচন পদ্ধতি বলা হয়। আধুনিককালে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন পদ্ধতি দু'প্রকার। যথাঃ ১। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও ২। পরোক্ষ নির্বাচন।

১। প্রত্যক্ষ নির্বাচন (Direct Election) ঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলতে সেই নির্বাচন পদ্ধতিকে বুঝায় যেখানে সাধারণত ভোটদাতাগণ তাদের ভোটের দ্বারা সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সাধারণ ভোটার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে কোন মধ্যবর্তী ভোটার থাকে না। এ পদ্ধতিতে সাধারণ ভোটার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ সরল। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এ নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতে লোকসভা ও বিধানসভার সদস্য নির্বাচনে এ প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান। জাতীয় সংসদের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচিত সদস্যগণ পরবর্তীতে সংসদ প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকে।

২। পরোক্ষ নির্বাচন (Indirect Election) ঃ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলতে সেই নির্বাচন পদ্ধতিকে বোঝায় যে নির্বাচন পদ্ধতিতে দেশের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ ভোটের মাধ্যমে একদল মধ্যবর্তী সংস্থার সদস্য নির্বাচন করে এবং পরে এ মধ্যবর্তী সংস্থার সদস্যরাই তাদের ভোটের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ফলে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে দুবার নির্বাচন হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণ ভোটদাতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত একটি মধ্যবর্তী সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন। আবার বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় সংসদ সদস্যগণকে নির্বাচিত করে। জাতীয় সংসদ সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ
Caretaker Government : A Conceptual Description

সাধারণভাবে তত্ত্বাবধায়ন করেন যিনি, তিনিই তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি বিশেষ ধারণা। এটা কোন স্বাভাবিক সরকার নয়। কোন দেশের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর আবির্ভাব ঘটে থাকে।

২.৮.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংজ্ঞা
Definition of Caretaker Government

প্রধানত কোন নির্বাচিত সরকারের প্রতি জনগণ যখন আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন সে সরকারকে আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে হয়। পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক সময়ের জন্য দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সাময়িকভাবে যে সরকার গঠিত হয়, সে সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়। সুতরাং নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে বা অনুপস্থিতিতে সাময়িক সময়ের জন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে, তাকেই বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছ থেকে আরেকটি স্বীকৃত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্ত ান্তরের জন্য যদি কোনো 'মধ্যবর্তী' সময়ের সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টি করা হয় এবং এ মধ্যবর্তী সময়ে কোনো 'সরকার' অথবা 'প্রশাসন' দায়িত্ব পালন করে, তবে এ সরকার অথবা প্রশাসনকে 'অন্তবর্তীকালীন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ অন্ত বর্তীকালীন সরকার-প্রশাসন স্বাভাবিক সকল নির্বাহী দায়িত্ব পালন করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সীমিত অর্থে অন্তবর্তীকালীন সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং মূল দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান।[২৩]

আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (Al Masud Hasanuzzaman) লিখেছেন, "Caretaker Government in the parlance of institutional government, a caretaker government is one which normally takes care of state administration for an interim period until the regular new government is formed. In established parliamentary system,

---

২৩. তারেক এম. টি. রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

there is a convention of transformation of the outgoing government into a caretaker government for the time being before the holding of general election. Such temporary government exists only to perform day to day administrative jobs, and is not supposed to deal with policy initiating functions which may influence the election results. During the period the caretaker government maintains neutral status for ensuring free and fair general elections." [২৪]

এক কথায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বুঝায়, যে সরকারের দায়িত্ব মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেয়া। নতুন সরকার শপথ গ্রহন করার সাথে সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তি ঘটে। অর্থাৎ কোন অ-রাজনৈতিক ও দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য গঠিত একটি সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে।

২.৮.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈশিষ্ট্য
Charactaristics of Caretaker Government

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নিম্নে সেগুলি তুলে ধরা হলোঃ

প্রথমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা খুবই সাময়িক। সাধারণত ৬ মাসের অধিককাল স্থায়ী হয় না।

দ্বিতীয়ত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক হয়। এরূপ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে কোন দলীয় ব্যক্তি থাকে না।

তৃতীয়ত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন আদর্শের ভিত্তি থাকে না। এরূপ সরকারের দলগত কোন কর্মসূচী থাকে না। কেবল একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, তা হলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচিত দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

চতুর্থত, রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক সংহতি রক্ষার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহন করে।

---

২৪. Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, University Press Limited, 1998.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কোন দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহন করতে পারে না। সুতরাং যতদূর সম্ভব দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখাই এর কাজ।

ষষ্ঠত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন আদর্শগত নির্দিষ্ট রূপরেখা না থাকার ফলে দেশের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে কোন আমূল পরিবর্তন আনতে পারে না। কেবল সকলের সাথে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

সপ্তমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। তাই নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা খুব শক্তিশালী হয়।

অষ্টমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল কর্মকান্ডই নিরপেক্ষ হয়। ফলে এরূপ সরকারের অধীনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায়।

নবমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ হচ্ছে নতুন করে নির্বাচন দিয়ে নিরপেক্ষভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নিশ্চিত করা, যাতে সরকারি দল নির্বাচনে কারচুপি করতে না পারে।

দশমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন নির্বাচিত সরকার নয়। তাই এ সরকারের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কোন বৈধতা থাকে না। সুতরাং নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর পরই এ সরকার বিদায় নিতে বাধ্য থাকে।

২.৮.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দোষ-গুণ

Merits and demerits of Caretaker Government

তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এর গুণ ও দোষ উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এ সরকারের গুণ বা সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ[২৫]

প্রথমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান গুণ হলো এটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার। এ সরকারের উপদেষ্টাগণ কোন দলের সাথে সংযুক্ত থাকে না বিধায়, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। তাছাড়া এরূপ সরকারের কোন সদস্যই কোন দলের পক্ষ থেকে বা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। তাই ভোট কারচুপির অভিযোগের সুযোগ এখানে খুব একটা থাকে না।

---

২৫. ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তৃতীয় পত্র (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলাদেশের সংবিধান ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা-৭০৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বাভাবিক কারণেই উন্নতমানের হয়। কারণ দেশের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণকে এ সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়। তারা নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুযায়ী নিজস্ব বিভাগ পরিচালনা করতে পারে। ফলে দেশ ও জনগণ উপকৃত হয়।

তৃতীয়ত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জনগণের অধিকার এবং স্বাধীনতা নিরপেক্ষভাবে রক্ষিত হয়। সরকারের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

চতুর্থত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়মিতান্ত্রিক হয়। এ সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংবিধানের নিয়মাবলি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে। তাই এরূপ সরকার একেবারেই নিয়তান্ত্রিক সরকার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপরোক্ত গুণসমূহ থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, এ সরকার একেবারে ত্রটিমুক্ত নয়। কারণ-

১। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদর্শগত কোন ঐক্যবন্ধন না থাকার ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটতে পারে। এ সবের মধ্যে সমন্বয় নাও থাকতে পারে। অথচ সহযোগিতা ও সমন্বয় ছাড়া কোন নীতিমালা সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।

২। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী। ফলে এ সরকারের ক্ষণস্থায়ীত্বের জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন সম্ভব হয় না।

৩। তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু মূলত নির্বাচন পরিচালনা করে। এর চেয়ে বেশি কিছু করার অধিকার এর নেই। সুতরাং কেবল কোন রকমে নির্বাচন পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করাই এর মূল লক্ষ্য।

৪। তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকাকালীন সময়টুকুতে দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত হয়।

৫। রাজনৈতিক বুলি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যতই জনপ্রিয় বা ভাল হোক না কেন, আইনের দৃষ্টিতে ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটি অব্যবস্থারই নামান্তর। সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যে কোন পর্যায়ে অস্থিতিশীলতার জন্ম দিতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

উল্লিখিত গুণ ও দোষ আলোচনা শেষে এ কথা বলা যায় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সাময়িক সরকার, দেশের বিশেষ রাজনৈতিক সংকটে এরূপ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং এ সরকারকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। আর সে দায়িত্ব হলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সুতরাং এ সরকারের কিছু দোষ থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায়, এ সরকার একটি মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে আসে এবং দেশকে রাজনৈতিক সংকটমুক্ত করে।

২.৯ বিভিন্ন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

The Caretaker Government in Different Countries

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচলন দেখা যায়। বিশেষত সংসদীয় কাঠামোয় পরিচালিত গণতন্ত্রচর্চাকারী দেশসমূহে 'নির্বাচনকালীন সরকার' হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি বেশ পরিচিত ও পুরনো। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (Al Masud Hasanuzzaman) বলেন, "In the parliamentary framework, after the dissolution of one ministry, the practice of establishing caretaker government for organising general polls has been observed in all democratic countries."[২৬] তবে পৃথিবীর কোন দেশেই বাংলাদেশের ন্যায় কাঠামোবদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। তারপরেও বিক্ষিপ্তভাবে 'কেয়ারটেকার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা' গঠনের বিধান বা দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নিচে বিভিন্ন দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

২.৯.১ ইংল্যান্ড ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

England and the Caretaker Government

সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি ইংল্যান্ডে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ১৯৪৫ সালের ২৩ মে তৎকালীন পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন লিওনার্দ স্পেন্সার চার্চিলের নেতৃত্বে।[২৭] উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন-এর স্থলে চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়।[২৮] উদ্দেশ্য ছিল যে কোন মূল্যে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্দে যুদ্ধে জয়লাভ করা। এরা দু'জনই ছিলেন রক্ষণশীল দলের নেতা। চলমান

---

২৬. Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, University Press Limited, 1998.

২৭. Henry Poling, Winston Churchill, P. 548., উদ্ধৃত ঃ মিজানুর রহমান খান, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৫৮।

২৮. উইলিয়াম ডগলাস হোম, The Prime Minister, উদ্ধৃত ঃ মিজানুর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ইংল্যান্ডের তিনটি প্রধান দলই নির্বাচনের বদলে একটি 'জাতীয় সরকার' চাচ্ছিল। চার্চিল সর্বদলীয় একটি 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করেছিলেন। এজন্য এ সরকারটি একটি 'জাতীয় সরকার' হিসেবেও গণ্য। চার্চিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ও মিত্রশক্তি যুদ্ধে ব্যাপকভাবে জয়ী হয়। 'যুদ্ধ জয়ের পর চার্চিল তার বিজয়ীর সুনাম কাজে লাগিয়ে পরবর্তী নির্বাচনের সুবিধা নিতে পারেন' – এমন কথা আলোচিত হতে থাকে। চার্চিলের জীবনীকার হেনরি পোলিং (Henry Poling) অবস্থাটি বিশ্লেষণ করেন এভাবে, "Liberal and Labour MP's were afraid that he would capitalize upon his reputation as the war winer to have a 'Khaki' election; and to allay their fears, he spoke of a period of two or three months after the end of the war in Europe, in the course of which suitable preparations could be made. This would allow time for the liberal and Labour parties to withdraw from the Government and for a 'Caretaker' administration to be constituted by the conservatives, who had been since 1935 the largest party in the chamber."[২৯]

এ অবস্থায় ১৯৪৫ সালের ২৩ মে চার্চিল সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের প্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন । সাথে সাথেই রাজা পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে একটি 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠনের আহ্বান জানান। তখন চার্চিল নিজ দলসহ অন্যান্য কিছু দলের সাহায্য নিয়ে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠন করেন। স্যার আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings) চার্চিলের সেই সরকারকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩০] শ্রমিকদল চার্চিলের জাতীয় সরকারে থাকলেও, তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অংশীদার হয়নি। এ সম্পর্কে হেনরী পোলিং-এর ভাষায়, "Churchill's new 'Caretaker' government consisted of Conservatives, National Liberals and a few non-party or National ministers who were prepared to continue in service."[৩১] কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন চার্চিলের 'রক্ষণশীল দলের'

---

২৯. Henry Poling, Op. Cit., P. 548., উদ্ধৃত ঃ মিজানুর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।

৩০. Ivor Jennings, Cabinet Government, 3rd Ed., Cambridge University Press, 1969, P. 84.

৩১. Henry Poling, Ibid., P. 548., উদ্ধৃত ঃ মিজানুর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ক্লিমেন্ট রিচার্ড অ্যাটলি-র নেতৃত্বে 'শ্রমিকদল' ব্যাপক বিজয় অর্জন করে ও সরকার গঠন করে।

২.৯.২ ভারত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার
India and the Caretaker Government

বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থার চর্চা রয়েছে। ভারতে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের প্রয়োজন পড়ে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে। এর আগে ১৯৭৯ সালের ৯ জুলাই ভারতীয় প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব এন রেড্ডি লোকসভার অধিবেশন ডাকেন। লোকসভার আস্থাভোটের মুখোমুখি না হয়েই জনতাদলের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই ও তার মন্ত্রিসভা ১৯৭৯ সালের ১৫ জুলাই পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট রেড্ডি এ পদত্যাগপত্র গ্রহন করেন ও একটি নতুন সরকার গঠন করা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার জন্য ("to continue in office till a new government is formed.") মোরারজি দেশাইকে অনুরোধ করেন। এরপর জনতা দলের সংসদীয় নেতার পরিবর্তন হয়। দেশাইর পরিবর্তে আসেন জগজীবনরাম। প্রেসিডেন্ট রেড্ডি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্য জনতা দলের নতুন নেতা জগজীবন রাম, বিরোধীদলীয় নেতা ওয়াই. বি. চ্যাবন ও সংসদে সংখ্যালঘু নেতা চৌধুরী চরণ সিং-এর সাথে আলোচনা করেন। ওয়াই বি চ্যাবন সরকার গঠনে অপারগতা জানান। জনজীবন রাম ও চৌধুরী চরণ সিং সরকার গঠনে রাজি হলেও, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট রেড্ডি সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এমতাবস্থায় তিনি সংসদীয় দলগুলোর কাছে তাদের দলীয় ও সমর্থক সাংসদদের তালিকা চেয়ে পাঠান। প্রাপ্ত তালিকা থেকে প্রেসিডেন্ট রেড্ডির মনে হল - চৌধুরী চরণ সিং লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন। তাই তিনি চরণ সিং-কে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান এবং ১৯৭৯ সালের আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে তাকে লোকসভার আস্থাভোটের মুখোমুখি হবার পরামর্শ দেন।[৩২]

কিন্তু ১৯৭৯ সালের ২০ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং ও তার মন্ত্রিসভা লোকসভায় আস্থাভোটের মোকাবেলা না করেই পদত্যাগ করেন ও লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট তাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহন করেন এবং ২০ আগস্ট তারিখেই এক পত্রে 'অন্য কোন

৩২. তারেক এম. টি. রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজন সম্পন্ন করা পর্যন্ত' চৌধুরী চরণ সিং-কে তার মন্ত্রিসভাসহ দায়িত্ব পালন করে যাবার অনুরোধ করেন। প্রেসিডেন্ট রেড্ডির এ সিদ্ধান্ত চরন সিং-এর সরকারকে একটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' (caretaker government)-এ পরিণত করে। আর এটাই ছিল ভারতীয় ইতিহাসের 'প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার'।' উল্লেখ্য, সে সময় দলীয় সদস্যদের হিসেবে ৫৪৪ আসনের লোকসভায় জনতা দলের ছিল ২০৫ জন ও চৌধুরী চরণ সিং-এর ছিল ৭৫ জন সদস্য। ভারতীয় প্রেসিডেন্টের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সে সময়, কলকাতা ও সবশেষে দিল্লির হাইকোর্টে রিট মামলা হয়।[৩৩] প্রতিটি মামলাতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চৌধুরী চরণ সিং-এর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। কিন্তু ৩টি কোর্টই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চৌধুরী চরণ সিং-এর নিয়োগকে বৈধ বলে রায় দেয়। তবে লক্ষ্যনীয় যে, হাইকোর্টের রায়ে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে- "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রিসভা কেবল 'দৈনন্দিন কার্যাবলী' পরিচালনা করবে, কোন 'নীতি নির্ধারণী' বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবে না।" ১৯৭৯ সালের ২৩ আগস্ট ভারতীয় স্টেটসম্যান পত্রিকার এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, "The Charan Singh's Government will not take decision during this period which set new policy or involve new spending of significant order or constitute major administrative and executive decision. However, work of an urgent nature involving the nations interest will not be help up."[৩৪]

যদিও কলকাতা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি দুর্গাদাস বসু (Durgadas Basu)-র মতো কোনো কোনো ভারতীয় সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞ পরবর্তীকালে কোর্টের এ রায়ের সমালোচনা করেছেন।[৩৫] তিনি নির্দিষ্ট করেই দাবি করেন যে, "ভারতীয় সংবিধানের অধীনে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বলে কিছু নেই।"[৩৬] অন্যদিকে ১৯৭৯ সালের ১০ অক্টোবর মাদ্রাজ হাইকোর্টের ৭ সদস্যের ফুল বেঞ্চ চৌধুরী চরণ সিং-এর সরকার সংক্রান্ত ২টি রিট মামলার রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংজ্ঞা প্রদান করেন এভাবে, "Though the constitution itself does not refer to a 'caretaker government' is, yet it is possible to under the

---

৩৩. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৪৩।

৩৪. Madan Murari V. Chowdhury Charan Singh, AIR 1980 CAL 95 (Para-20).

৩৫. Durgadas Basu, Commentary on the Constitution of India, Vol. E, 1981, PP. 411-14.

৩৬. Durgadas Basu, Ibid, PP. 411-14.

Dhaka University Institutional Repository

expression, 'caretaker government' as the Government in power after dissolution of the 'Lok Sabha' and before its reconstitution."[৩৭]

২.৯.৩ পাকিস্তান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার
Pakistan and the Caretaker Government

উপমহাদেশের অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তানেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচলন রয়েছে। পাকিস্তানের সংবি

ধানের ৯১ নং অনুচ্ছেদের আওতায় অনির্বাচিত ব্যাক্তিসমন্বয়ে মন্ত্রিসভা ও উপদেষ্টা পরিষদ উভয়ই গঠনের সুযোগ রয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানের ৪৮(৫) নং অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্টকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে । এতে উল্লেখ করা হয়েছে -

48(5)- Where the President dissolves the National Assembly, he shall, in his discretion :

(a) Appoint a date, not later than ninety days from the date of the dissolution, for the holding of a general election of the assembly and

(b) Appoint a Care-taker cabinet.

পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের মূল সংবিধানেও নির্বাচনের আগে এ রকম পদত্যাগী মন্ত্রিসভাকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এ পরিণত করার বিধান রাখা হয়। পরবর্তীকালে বছর বছর পাকিস্তানের সংবিধানের খোল-নলচে বদলেছে সত্য, কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে প্রেসিডেন্টের হাতে এ ক্ষমতা সবসময়ই সংরক্ষণ করে দেয়া হয়েছে, যাতে তিনি নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৩৭(৪) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, " ... but no person shall be appointed a minister of state or Deputy Minister unless he is a member of the national Assembly." কিন্তু এ অনুচ্ছেদরই ৩৭(৯) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়, "Nothing in the Article shall be constructed as disqualifying the Prime Minister or any other Minister, or a Minister of State of Deputy Minister, for continuing in office

৩৭. মাদ্রাজ হাইকোর্ট, রিট নং- ৩৬৭১ ও ৩৭৪২, ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

duting any period during which the National Asssembly stands dissolved, or as preventing the appointment of any person as Prime minster or other Minister, or as Minister of State or deputy Minister, during any such period."

পাকিস্তানের মূল সংবিধানের এ বিধানের ভাষাগত পরিবর্তন হতেই সম্ভবত পরে ১৯৭৩ সালের নতুন সংবিধানে সোজাসুজি 'Care-taker Cabinet' কথাটি যুক্ত হয়। সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান থাকলেও, এ সরকারের কর্মপরিধি সম্পর্কে কোন সীমাবদ্ধতার নির্দেশ নেই। তাই সেখানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকারের মতোই কার্যক্রম চালাতে পারে। পাকিস্তানের সংবিধানে এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি।[৩৮]

১৯৮৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হক নিহত হবার পর পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বেনজির ভুট্টো সরকার গঠন করেন। পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে। সরকার গঠন করেন নওয়াজ শরিফ। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে মঈন কোরেশির নেতৃতে গঠিত তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালেই। তাই তুলনামূলক বিচারে মঈন কোরেশির নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

২.৯.৪ নেপাল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার
Nepal and the Caretaker Government

নেপালে প্রথমবারের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় ১৯৯০ সালে। ১৯৬১ সাল থেকে টানা তিন দশক ধরে বহাল দলহীন পঞ্চায়েত সরকার পদ্ধতির বিরুদ্ধে নেপালে একপ্রকার বিপ্লব শুরু হয় ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে। অবশেষে রাজা সবধরনের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিতে রাজি হন এবং প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টরায়ের অধীনে একটা 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠনের ঘোষণা দেন। রাজা এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য দরকারি নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার ক্ষমতা দান করেন।

---

৩৮. Keith, British Cabinet System, 1952, PP. 43-44.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালের ৩১ মে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুপারিশে রাজা একটা 'সংবিধান সুপারিশ কমিশন' গঠন করেন। নেপালের সাবেক প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় সেই সুপারিশ কমিটি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজা ১৯৯০ সালের নভেম্বরে অন্তর্বর্তী সরকারের সুপারিশেই ঐ কমিশনের তৈরী করা সংবিধানের খসড়া অনুমোদন করেন। নতুন সংবিধানের অধীনে সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৯১ সালের মে মাসে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের অনেক সদস্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সরকারের এ 'কোয়ালিশন' স্বভাবের কারণেই এর নিরপেক্ষতা কম বেশি নিশ্চিত হয়েছিল। এজন্যই এ সরকারের কাজকর্ম বিতর্কের মুখে পড়েনি। প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্বাচনে হেরেছিলেন। নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা গ্রহনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। তবে এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ছিল না।

২.৯.৫ অস্ট্রেলিয়া ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

Australia and the Caretaker Government

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ায় বিরোধী দল সিনেটে লেবার দলীয় সরকারের বাজেট কর্মসূচী একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। দেশ তখন দেউলিয়া হওয়ার যোগাড়। গভর্নর জেনারেল স্যার জন কের যখন দেখলেন প্রধানমন্ত্রী গাফ হুইটলাম সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালানোর জন্য অর্থসংস্থান নিশ্চিত করতে পারছেন না, আবার ওদিকে তিনি একটা নতুন নির্বাচন ডাকার পরামর্শও দিচ্ছেন না বা পদত্যাগও করছেন না; তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী গাফ-এর উপর থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়দায়িত্ব প্রত্যাহার করার মাধ্যমে তাকে একপ্রকার পদচ্যুতই করেন। বাজেট পাস করা হবে –এ আশ্বাসের বিনিময়ে লিবারেল দলের নেতা ম্যালকম ফ্রেজারকে 'তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী' করা হয়। এটা ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কেননা ২০০ বছরে এ প্রথমবারের মতো রানীর কোন প্রতিনিধি একজন প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করা হয়। পরে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অষ্ট্রেলিয়ার এ রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.১০ বাংলাদেশ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার
Bangladesh and the Caretaker Government

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী সংযোজন হচ্ছে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। স্বাধীনতার পর হতে নির্বাচনে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের কারণে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা দুরত্ব তৈরি হতে থাকে। এ সকল ছকে বাঁধা ও পূর্ব-নির্ধারিত প্রহসনমূলক নির্বাচনের কারণে এর উপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস কমতে থাকে। জেনারেল এরশাদের আমলে নির্বাচনের উপর জনগণের অবিশ্বাস চরমে পৌছে। ফলে স্বচ্ছ নির্বাচনের আশায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সকলে একযোগে আন্দোলনে সামিল হয়। আর দীর্ঘ আন্দোলনের এক পর্যায়ে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সর্বপ্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি উত্থাপিত হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশসমূহে কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ হলে কিংবা সংসদে আস্থা হারানোর ফলে নির্বাচনের প্রয়োজন হলে, সেই রাজনৈতিক দলই তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি হলো সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে কিংবা নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হবার পর ৯০ দিন অর্থাৎ তিন মাসের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ সরকারের মূল কাজ হলো সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (Al Masud Hasanuzzaman) বলেছেন, "The neutral caretaker government of Bangladesh had been the products of intense opposition movement centering on the forceful demand for free and fair general polls. By legalizing caretaker government through Thirteenth Amendment of the Constitution in 1996, Bangladesh has founded a unique example in the existing parliamentary systems."[৩৯]

---

৩৯. Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, University Press Limited, 1998.

Dhaka University Institutional Repository

২.১১ বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি (১৯৯০-৯৬)

History of Formating the Caretaker Government in Bangladesh (1990-96)

একটি বিদায়ী সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আইনানুগ রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিগুলির কতখানি সুষ্ঠু প্রয়োগ করবে এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কতটা স্বচ্ছতা ও পক্ষপাতহীনতার পরিচয় দেবে – এ সন্দেহ থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিটি উঠে আসে। তবে বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর জন্য সুদীর্ঘ কালব্যাপী সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি প্রথম উচ্চারিত হয় একটি অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে।[৪০] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ দাবি ওঠে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে নেয়ার একটি অহিংস ও সম্মানজনক বিকল্প হিসেবে।[৪১] তবে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম 'জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ' নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব ও দাবি উত্থাপন করে এবং এজন্য একটি ফর্মূলা উপস্থাপন করে।[৪২] সমসাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে, জামাতে ইসলামীর তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান রমনা রেস্তোরাঁয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা প্রকাশ করেন।[৪৩] তবে এ ধারণা বাস্তবায়নের কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের।[৪৪]

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বচ্ছ হিসেবে বিপুল সমাদৃত হয়েছিল এবং আপামর জনগণের আন্দোলনে প্রভাব ফেলেছিল যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত যতগুলি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে ব্যাপক অনিয়ম এবং ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক নির্বাচনে কারচুপি, অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু প্রভৃতি

---

৪০. সাপ্তাহিক রোববার, ৮ মে, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃঃ ১৩।

৪১. তারেক এম. টি. রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৪৫।

৪২. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৪৫।

৪৩. বিচারপতি লতিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা, জুলাই, ২০০২, ঢাকা, পৃঃ ৭৬।

৪৪. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির গতিধারা, ঝিনুক প্রকাশ, ২০০২, পৃঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং বাস্তবেও তা ঘটেছে। এর মধ্যে সামরিক শাসকদের তিনটি গণভোটে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি কার্যত ভোটার শূন্য থাকলেও, প্রত্যেকটি গণভোটে ৯০% এর অধিক ভোটারের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ন্যাপ ও জাসদ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গেও বিরোধী দলসমূহ একই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। স্বৈরাচারী এরশাদের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে এত বেশী পরিমানে কারচুপি হয়েছে যে, এ নির্বাচনগুলি কার্যত প্রহসনে পরিনত হয় এবং নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। এতে সমগ্র দেশবাসী বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে গঠিত দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।[৪৫] এ উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান দাবিতে পরিণত হয়।

২.১১.১ ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি
History of Formating the Caretaker Government of 1990

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ নির্বাচিত সরকার হটিয়ে অস্ত্রের মুখে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন জেনারেল এরশাদ। অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখল এবং নিজের ও নিজ দলের স্বার্থে স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা চর্চা করার কারণে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মধ্যে এরশাদ বিরোধী মনোভাব জন্মলাভ করে। ফলে তার বিরুদ্ধে রীতি অনুযায়ী প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালেই এরশাদের অগণতান্ত্রিক ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুটি বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। একটি জোট গঠিত হয় ১৫টি দলকে নিয়ে এবং আরেকটি জোট গঠিত হয় ৭টি দলকে নিয়ে। ১৫ দলীয় জোটের নেতৃত্ব দেয় আওয়ামী লীগ, আর ৭ দলীয় জোটের নেতৃত্ব দেয় বি. এন. পি.। পরবর্তীতে চলতি রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জরুরি দাবি হিসেবে ১৯৮৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের সমঝোতার ভিত্তিতে দুটি ভিন্ন মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয় ৫ দফা দাবি। এ ৫ দফা দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

---

৪৫. হারুন - অর - রশিদ, বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ ১৮৬১-২০০১, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃঃ ৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

১। অবিলম্বে সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২। অবিলম্বে দেশে জনগণের সকল মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বিধি-নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে অন্য যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কেবল সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সংবিধান সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা কেবল জনগণের সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্য কারো নয়।

৪। রাজনৈতিক কারণে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হয়রানী ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৫। ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ছাত্র হত্যাসহ সামরিক আইন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ যাবৎকাল ছাত্র-শ্রমিক রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যার বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান, নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, ক্ষেত মজুরসহ সকলের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সে সময় থেকেই যুগপৎ আন্দোলনের ধারার সূচনা হয়। এ ৫ দফা দাবি রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণীত করে। বিরোধী জোটসমূহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলনের ডাক দেয়। সামরিক আইনের অবসান ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দুই জোট ও জামাতে ইসলামী আন্দোলন তীব্রতর করার উদ্যোগ নেয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সভা, মিছিল, হরতাল ও সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির পথ বেছে নেয়। এর মধ্যে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে যুগপৎ আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কারণ ১৫ দলীয় জোটের অর্ন্তভূক্ত ৮ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশ নিলেও, ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বয়কট করে। ফলে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলির সমঝোতা ভেঙ্গে পড়ে।

কিন্তু হঠাৎ করেই বিভিন্ন কারণে ১৯৮৭ সালের মধ্যভাগে নতুন করে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের নবতর অধ্যায়ের সূচনা হয়। বিরোধী দলসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচি

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ সরকারকে চরম সংকটে ফেলে দেয়।[৪৬] বিরোধী দলসমূহের মনোভাব জেনেও জেনারেল এরশাদ ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ আরও একটি সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে। আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি., জামাতে ইসলামী ইত্যাদি প্রধান বিরোধী দল এ নির্বাচন বর্জন করে। এ প্রেক্ষাপটে বিশেষত ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির ভোট ডাকাতি এবং ১৯৮৮ সালের ভোটার ও প্রতিযোগিতাবিহীন নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে যায়।

১৯৯০ সালে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন অব্যাহতভাবে প্রচন্ড গতিতে বেগবান হয়ে উঠে। এরশাদের নয় বছর স্থায়ী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলনের শেষ ভাগে সারা দেশ হরতাল, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ, আর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠে। এরশাদ সরকারও এ আন্দোলন দমনের জন্য সবরকম চেষ্টা চালায় এবং অনিবার্য রক্তপাত ঘটতে থাকে দেশজুরে। এ অবস্থায় ১৯৯০ সালের অক্টোবরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সরকার পতনের দৃঢ় শপথ ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জেনারেল এরশাদের পতন দ্রুত নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালের ১৮ নভেম্বর ৮, ৭ এবং ৫ দলীয় জোট একটি রূপরেখা ঘোষণা করে।[৪৭] এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি সামনে চলে আসে। 'বিরোধী দল একমাত্র একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই কেবল সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহন করবে, অন্যথায় নয়'—এ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে। তিন জোটের বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার ঘোষণা সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে নতুন রূপ দান করে। তিন জোটের রাজনৈতিক রূপরেখার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ[৪৮]

১। অবিলম্বে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের ৫১ (ক) ৩ দফা, ৫৫ ক (১) দফার বিধান অনুযায়ী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনরত জোট ও দলসমূহের নিকট গ্রহনযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির) নিকট জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

---

৪৬. হারুন - অর - রশিদ, ঐ, পৃঃ ৩৩৯।
৪৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০।
৪৮. হারুন - অর - রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

২। এভাবে নিযুক্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাকধায়ক সরকার জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে তিন মাসের মধ্যে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং নির্বাচনের পর নির্বাচিত জাতীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

৩। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সে জন্য ঃ

(ক) প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহন।

(খ) সকলের আস্থাভাজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন।

(গ) নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) নির্বাচনকে যে কোন প্রকার সরকারী হস্তক্ষেপ অথবা পক্ষপাত মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) ভোটারদের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভোট প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ভোট কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং যে কোন বাধাকে কঠোরভাবে দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

(চ) নির্বাচনী এলাকায় ব্যলটের হিসাব ও বন্টন তদারকির জন্য প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্টদের সুযোগ, গণনা শেষে কেন্দ্রেই চূড়ান্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করে ফলাফলের সত্যায়িত কপি প্রার্থীদের এজেন্টদের নিকট প্রদান করা।

(ছ) গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ ব্যবহার, ভোট কারচুপি প্রতিরোধ, কার্যকর নিবৃত্তিমূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন।

(জ) নির্বাচনের নিরপেক্ষতা পর্যবেক্ষনের জন্য পর্যবেক্ষকদের সুযোগ প্রদান।

৪। দেশে স্থায়ীভাবে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সাংবিধানিক ধারা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার ধারা সুপ্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অব্যাহত অগ্রগতি নিশ্চিতকল্পে সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের মতানৈক্য সত্ত্বেও সাধারণ কতগুলো বিষয়ে দৃঢ়ভাবে জনগণের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে, সে বিষয়গুলো হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

(ক) জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে।

(খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। নিবর্তনমূলক কালাকানুন বাতিল করা হবে এবং এমন কোন আইন কখনও প্রণয়ন করা হবে না।

(গ) সরকার পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদ হবে সংবিধান সম্মতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহন ও কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এবং সেই সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠদের মত ও অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গণতান্ত্রিক রীতিরও বিকাশ ঘটানো হবে। জনগণের ভোটের মাধ্যমে সরকারের উপর জনগণের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হবে।

(ঘ) প্রশাসনে পরিপূর্ণ দল-নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। গণ-মাধ্যমসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

(ঙ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক রীতি ও সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরম সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার আলোকে রাজনৈতিক আচরণও দৃঢ়মূল করা হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উল্লিখিত ঘোষণা এরশাদ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে তোলে। অবশেষে তীব্র আন্দোলন ও প্রতিরোধের মুখে জেনারেল এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর তিন জোটের মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন। তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে দেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদকে এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন এবং তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আর এভাবেই তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় রাংলাদেশের ইতিহাসে 'প্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ সতের জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রথমবারের মত এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ ১৫ মার্চ তার উপদেষ্টা পরিষদ বিলোপ ঘোষণা করেন।[৪৯]

২.১১.২ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি

History of Formating the Caretaker Government of 1996

১৯৯১ সালে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নজিরবিহীন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে যে বি.এন.পি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, কালক্রমে সে বি.এন.পি সরকারের আমলেই আবারও সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুটি ধীরে ধীরে সামনে চলে আসে।[৫০] ১৯৯৩ সালের মিরপুর আসনের উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ দাবির অবতারণা ঘটে। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের এ দাবি আরও জোরালো হয়।

একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয়ী হয়ে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা লাভ করেন। সাধারণ প্রত্যাশা ছিল ভবিষ্যতেও নির্বাচনের এ সুষ্ঠু ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১১টি নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপ-নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস, হাঙ্গামা ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ উত্থিত হয়।[৫১] অতঃপর ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বি.এন.পি সাংসদ হারুন মোল্লার মৃত্যুতে মিরপুর নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বি.এন.পি প্রার্থী মোহাম্মদ মহসীন বিজয়ী হয়। এ নির্বাচনেও বি.এন.পি ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় গ্রহন করে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ ভোট কারচুপির প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে হরতাল পালন করে এবং ১৬ কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন দাবি করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সূচনা এখানেই।

---

৪৯. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ, ১৯৯১।

৫০. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৫১. ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৮, পৃঃ ২৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি দেশের চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু'টি প্রধান সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীগণ মেয়র পদে বিজয়ী হন। এ নির্বাচনে পরাজয়ের প্রেক্ষিতে বি.এন.পি শংকিত হয়ে উঠে এবং পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে যে কোন উপায়ে জয় লাভের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। এ চিন্তাভাবনার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাগুরা উপ-নির্বাচনে।[৫২] আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর পর ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আসনটি আওয়ামী লীগের হলেও, বি.এন.পি প্রার্থী কাজী সলিমুল হক কামাল বিজয়ী হন। সকল বিরোধী দল নির্বাচনে বি.এন.পি'র পক্ষে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের কারচুপি অতীতের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। উক্ত নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন একজন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, মাগুরা উপ-নির্বাচন তার দেখা সবচেয়ে প্রহসনমূলক নির্বাচন ছিল।[৫৩]

মাগুরা উপ-নির্বাচনের অভিজ্ঞতা বিরোধী দলগুলির মধ্যে এ আশংকা দৃঢ়মূল করে যে, বি.এন.পি দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। মাগুরার ঘটনা বি.এন.পি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার নৈতিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের রাজনীতি হয়ে পড়ে সংঘাতপূর্ণ।[৫৪] মাগুরা উপ-নির্বাচন সম্পর্কে এক সংবাদ ভাষ্যে বলা হয় - "বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নতুন কলংকজনক অধ্যায়ের নব সূচনা জাতিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।"[৫৫] বিরোধী দলগুলো বি.এন.পি সরকারকে সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল আনতে বলে। বি.এন.পি এতে অপারগতা প্রকাশ করে। বি.এন.পি'র নীতি নির্ধারকরা বলতে থাকেন, পৃথিবীর কোন দেশেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে 'অন্যায় আবদার' ধরনের অভিযোগ করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলস্বরূপ - একদিকে শুরু হয় লাগাতার সংসদ অধিবেশন বর্জন ও অন্যদিকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে দাবিতে আন্দোলন। আন্দোলনকারী দলসমূহ ঘোষণা করেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত না করা পর্যন্ত তারা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগদান করবেন না।[৫৬]

---

৫২. মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, রিকো প্রিন্টার্স, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭, পৃঃ ৩৬১-৬২।
৫৩. হারুন - অর - রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮০।
৫৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ, ১৯৯৪।
৫৫. দৈনিক ইনকিলাব, ২১ মার্চ, ১৯৯৪।
৫৬. হারুন - অর - রশিদ, ঐ, পৃঃ ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন বিরোধী দলসমূহের পক্ষ থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রূপরেখা ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ ভবন সভাকক্ষে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে এ ঘোষণা প্রদান করেন।[৫৭] উক্ত রূপরেখায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছিল নিম্নরূপঃ[৫৮]

প্রথমত, একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়ত, অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের নিকট গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ প্রধানমন্ত্রীই সরকারের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তার কাজ পরিচালনা করবেন।

তৃতীয়ত, অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহন করবেন না। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

চতুর্থত, এ সরকারের মূল দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

পঞ্চমত, নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়াও জরুরি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

সপ্তমত, নির্বাচন কমিশনকে আরও জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে কমিশনকে পুনর্গঠন এবং এর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে একে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

---

৫৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ জুন, ১৯৯৪।

৫৮. ড. মোঃ আদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালের ২৮ জুন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে 'উদ্ভট প্রক্রিয়া' এবং গণতন্ত্রের নামে 'স্বৈরতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেন।[৫৯] সংসদের নেত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দল ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাকে 'অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক' বলে অভিযুক্ত করেন।[৬০] তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের অনমনীয় মনোভাব ও গড়িমসীর কারণে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে ক্রমেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে একত্রে আন্দোলন আরম্ভ করে।[৬১]

বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তনের প্রশ্নে উদ্ভূত রাজনৈতিক এ অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৩ অক্টোবর কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা আনিয়াকুর দূত হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বিচারপতি স্যার নিনিয়ান স্টিফেন সপত্নীক ঢাকায় আসেন । তিনি সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর সাথে আলোচনা করে একটি ফর্মূলা পেশ করেন, যার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় সরকারের আদলে পরোক্ষভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান ছিল।[৬২] কিন্তু একটানা ৪০ দিন ধরে চেষ্টা করেও, স্যার নিনিয়ান স্টিফেন বিবদমান দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে সংকট নিরসনে ব্যর্থ নিনিয়ান স্টিফেন ১৯৯৪ সালের ২১ নভেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। এরপর ১৯৯৪ সালের নভেম্বরেই বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদের একটি প্রস্তাব নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক সমঝোতার উদ্যোগ নেন। কিন্তু সরকারি দলের অনঢ় মনোভাবের দরুন সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

১৯৯৪ সালের ৬ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী পৃথক পৃথক সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, এ সময়ের মধ্যে সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নিলে ২৮ ডিসেম্বর তারা

---

৫৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জুন, ১৯৯৪।
৬০. দৈনিক সংবাদ, ৩০ জুন, ১৯৯৪।
৬১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।
৬২. The Daily Star, 21 November, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সাংসদ একযোগে পদত্যাগ করেন।[৬৩] পদত্যাগের পর কিভাবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে, সেই সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সে সরকারের বৈধতা কিভাবে নিশ্চিত করা হবে - সে সম্পর্কে বিরোধী দলগুলো একই দিনে অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বরেই পৃথক পৃথক জনসভা থেকে ৭টি দাবি সংবলিত একটি অভিন্ন ফর্মূলা দেয়।[৬৪]

সরকারি দলের সংসদের স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী ১৪৭ জন সাংসদের সংসদ সদস্যপদে পদত্যাগ পত্রগুলোর গ্রহনযোগ্যতার প্রশ্নে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উছিলায় তার সিদ্ধান্ত প্রদানে গড়িমসি করে প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। শেষ পর্যন্ত সরকারি দলের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি স্পিকার বিরোধী সাংসদদের পদত্যাগ পত্রগুলো নাকচ করে দেন। কিন্তু তাদের অনুপস্থিতির ৯০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী তাদের আসনগুলো শূন্য হবে কি-না রাষ্ট্রপ্রতি এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাইলে, দীর্ঘ শুনানি শেষে কোর্ট আসন শূন্য হওয়ার পক্ষে মত দেয়। ফলে ১৯৯৫ সালের ২০ জুন থেকে বিরোধী দলের ১৪২টি আসনের সদস্যপদ শূন্য ঘোষনা করা হয়।[৬৫] সংসদ থেকে পদত্যাগের পাশাপাশি বিরোধী দল বিক্ষোভ, হরতাল, ধর্মঘট এবং অবরোধ ও ঘেরাও-এর পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। এরূপ পরিস্থিতিতে জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে উক্ত দিনেই জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন।[৬৬] তখন নতুন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কয়েক দফা পিছানোর পর সম্পূর্ণ একদলীয়ভাবে শুধুমাত্র বি.এন.পি'র অংশগ্রহনের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচন বর্জন করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন এ নির্বাচনেও ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে।

---

৬৩. দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।
৬৪. দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।
৬৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ আগস্ট, ১৯৯৫।
৬৬. দৈনিক সংবাদ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিবিসির সাংবাদিক আতাউস সামাদ এক প্রতিবেদনে বলেন, "নির্বাচনে বি.এন.পি প্রার্থীদের পক্ষে যে বিপুল ভোট প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে তাতে নিজের চোখ কানের উপর বিশ্বাস নষ্ট করতে হয়।"[৬৭] আবার বি. বি. বিশ্বাস লিখেছেন, "মাগুরা উপ-নির্বাচনের চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় কারচুপি ও সহিংসতার মধ্যে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ - এর ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয় ষষ্ঠ সংসদ।"[৬৮]

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলো ১৯৯৬ সালের ৯ মার্চ থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক ও অবিরাম অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষনা করেন। অসহযোগ আন্দোলনে দেশ যখন অচল হয়ে পড়ে, তখন বি.এন.পি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করে দ্রুত ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। ২১ মার্চ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে 'সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল' জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়।[৬৯] ২৭ মার্চ সংসদ কর্তৃক বিলটি পাস হয় এবং ২৮ মার্চ বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. ফকরুদ্দিন আহমদ (Dr. Fakhruddin Ahmed) লিখেছেন, "The ruling party, however, ignoring the oppositions demands decided to call the first session of the sixth parliament in orded to give legitimacy to February 15, 1996 polls. At the same time they said that they wanted to amend the constitution by introductng a bill which would allow for the formation of a non-party caretaker government after dissolution of the new parliament. The President Summond the first and only session of the sixth parliament on 19 march 1996. The caretaker government bill was tabled on March 21, 1996 and passed four days later as 13th amendment to the constitution."[৭০]

---

৬৭. দৈনিক সংবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।

৬৮. বি. বি. বিশ্বাস, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নীলা পাবলিশার্স, ঢাকা, জুলাই, ২০০১, পৃঃ ৫।

৬৯. দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ, ১৯৯৬।

৭০. Dr. Fakhruddin Ahmed, The Caretakers : A First Hand Account of the Interim Government of Bangladesh (1990-91), P.128.

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্বলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের পর বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনাক্রমে সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলীকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। ৩১ মার্চ বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ৩ এপ্রিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশজন উপদেষ্টা শপথ গ্রহন করেন। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অবাধ ও স্বচ্ছ সপ্তম সংসদীয় নির্বাচন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে এবং ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান হয়।[৭১] ১২ জুনের নির্বাচনটি ছিল সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন।[৭২]

৭১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জুন, ১৯৯৬।
৭২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়া

Caretaker Governments of 1990 and 1996 and The Process of Transition to Democracy

নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারগণ কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগ গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় শাসন করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন বাংলাদেশে কখনো স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। সাধারণতঃ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ আমলে এবং স্বাধীনতার পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরকালে শাসক গোষ্ঠী অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে ও ঈর্ষান্বিত ভাবেই নির্বাচন দেয়।[১] এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চেয়ে ক্ষমতা বৈধকরণের উপায় হিসেবেই নির্বাচনের অভিনয় করা হয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বের ও উন্নয়শীল যে কোন দেশের তুলনায় এখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণতন্ত্রের এরূপ আত্মতৃপ্তিকর ও অনিয়মিত চর্চা খাঁটি ও মজবুত গণতান্ত্রিক ভিত্তির বিকাশে খুব একটা সহায়ক হয় নি।[২] নির্বাচন স্বয়ং গণতন্ত্র না হলেও, এ লক্ষ্যে এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীনতার উনিশ বছরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল গভীরে গ্রোথিত হয় নি। কিন্তু বাংলাদেশের ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ক্ষমতার বৈধকরণ কিংবা শাসকদের হাতবদল কোনটাই ছিলো না। বরং তা ছিলো জাতির ভবিষ্যত ভাগ্য কি হবে - তা নির্ধারণ করা। কেননা এখানে কোন ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে। তাই ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

---

১. The Weekly Holyday, 11 April, 1986.
২. The New Nation, 8 May, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার
Caretaker Government of 1990

এরশাদ-বিরোধী দুর্বার গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পতন ঘটে। দেশের এরূপ পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে তিন জোট এবং আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থিত নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়। রাজনৈতিক দলসমুহ তাদের ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুসারে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে মনোনীত করে। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তার কার্যকালের এ সংক্ষিপ্ত সময়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

প্রথমত, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংবিধান অনুযায়ী তিনি ছিলেন একাধারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান।

দ্বিতীয়ত, ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পদে বহাল থাকা।

৩.১.১ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন
Formation of Non-party Caretaker Government

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন।[৩] প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহ্মদ সংবিধানের ৫১-ক (৩) নং ধারা অনুযায়ী পদত্যাগ করেন। সংবিধানের ৫৫(১) নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তিন জোটের মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে সংবিধানের ৫৫-ক (১) নং ধারা অনুযায়ী নয়া উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। সংবিধানের ৫১(৩) নং ধারা অনুযায়ী এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ অস্থায়ী রাষ্টপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন। ফলে সাহাবুদ্দিন আহ্মদ একাধারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

৩. দৈনিক সংগ্রাম, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ লাভের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, "এরশাদের পদত্যাগ গণতন্ত্রের বিজয়। বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করে যথাসম্ভব দ্রুত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করাই আমার একমাত্র দায়িত্ব।"[৪] অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ ও মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য তিন দলীয় জোট রাষ্ট্রপতির নিকট তাদের প্রস্তাব পেশ করেন। তিন দলীয় জোট কর্তৃক প্রস্তাবিত তালিকায় ৩১ জন ব্যক্তির নাম ছিল, যাদের মধ্য হতে সর্বমোট ১৭ জন প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও নির্দলীয় ব্যক্তিকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করেন। রাজনৈতিক জোট বা দল কর্তৃক মনোনীত হলেও, উপদেষ্টাগণ কোন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং তাদের অধিকাংশই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক আমলা। অবশ্য ১৭ জনের মধ্যে একজন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আমলা, চারজন অধ্যাপক (যাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য), একজন ডাক্তার, একজন প্রাক্তন বিচারপতি ও একজন আইনজীবী।[৫]

নিচে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নাম ও মন্ত্রণালয়ের নাম উল্লেখ করা হল ঃ[৬]

---

৪. দৈনিক সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

৫. ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ সংঘাত ও পরিবর্তন, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস লিঃ, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃঃ ৩৪২।

৬. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪, পৃঃ ৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

উপদেষ্টাদের নাম	মন্ত্রণালয়ের নাম
১। বিচারপতি এম. এ. খালেক	আইন, বিচার এবং সংসদীয় বিষয়
২। জনাব কফিল উদ্দীন মাহমুদ	অর্থ
৩। জনাব ফকরুদ্দীন আহমদ	পররাষ্ট্র
৪। অধ্যাপক রেহমান সোবহান	পরিকল্পনা
৫। অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	জ্বালানি, খনিজ সম্পদ এবং পূর্ত কর্ম
৬। অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	শিক্ষা
৭। জনাব আলমগীর এম. এ. কবীর	সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া
৮। জনাব এ. কে. এম. মুসা	শিল্প, পাট এবং বস্ত্র
৯। জনাব কাজী ফজলুর রহমান	সেচ, পরিবেশ, বন, মৎস ও পশু সম্পদ
১০। এ. মাজেদ	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
১১। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম)	জাহাজ, নৌ-চলাচল এবং পর্যটন
১২। অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দীন আহমদ	সংস্কৃতি ও খাদ্য
১৩। জনাব এ. বি. এম. জি. কিবরিয়া	যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ
১৪। জনাব ইমাম উদ্দীন আহমদ	বাণিজ্য
১৫। জনাব বি. কে. দাস	ত্রাণ ও পুনর্বাসন
১৬। জনাব এম. আনিসুজ্জামান	কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা
১৭। চৌধুরী এম. এ. আমিনুল হক	শ্রম, জনশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন। তিনি তার বিভিন্ন বিবৃতি ও ভাষণে বার বার বলেন, আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা বা বিঘ্ন সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টাকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে কোন রাজনৈতিক দলের নির্দেশে অসদুপায় অবলম্বন তার সরকার সহ্য করবে না। তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমুহ কর্তৃক বেআইনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।[৭]

তিন দলীয় জোটের যৌথ ঘোষণার অন্যতম দাবি ছিলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা। তদনুসারে ৮ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের দাবি জানায়। এতে ৭ দলীয় জোট প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তিন দলীয় জোটের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আব্দুর রউফকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিচারপতি মেসবাহ উদ্দীনকে নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে কমিশন পুনর্গঠন করেন।[৮] নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ১৯৯১ সারের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচনী তফসিল ও ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়।

১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ছিল সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। তারপরেও বলতে হয়, এটা ছিল জনগণের আশা আকাঙ্খা ও বিরোধী জোটের স্বপ্নের প্রতিফলন। তাই সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বৈধতা দেয়া হয়।[৯] দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে - "১৯৯০ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারটি সংবিধান বহির্ভূত ছিল; তারপরেও সুষ্ঠু নির্বাচন, একাদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের স্বপদে পুনরায় ফিরে যাওয়ার কারণে শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ ধারণা ব্যাপক প্রশংসিত হয়।"[১০]

৩.১.২ ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

Fifth Jatiyo Sangsad Election of 1991

নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এটাই ছিল প্রথম নির্বাচন। সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অতীতে এভাবে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

৭. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ জানুয়ারি, ১৯৯১।
৮. ডঃ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৯।
৯. জনকণ্ঠ পাক্ষিক, সংখ্যা-২১, ঢাকা, ২২ এপ্রিল থেকে ৬ মে, পৃঃ ৯-১৩।
১০. দৈনিক জনকণ্ঠ, বিকাশমান গণতন্ত্র এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সাময়িকী, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

হয় নি। জনগণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। এ নির্বাচনের সমগ্র ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা যায় যে, ৩০০টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) ১৪১টি আসন লাভ করে শীর্ষে অবস্থান করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ লাভ করে ৮৮টি আসন। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি আশাতীতভাবে লাভ করে ৩৫টি আসন এবং জামাতে ইসলামী পায় ১৮টি আসন। ভোটের হার অনুপাতে বি.এন.পি পায় শতবরা ৩১ ভাগ, আওয়ামী লীগ পায় শতকরা ২৮ ভাগ, জাতীয় পার্টি পায় শতকরা ১২ ভাগ এবং জামাতে ইসলামী পায় শতকরা ৬ ভাগ।[১১]

লক্ষণীয় যে, ৬টি রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকে সর্বনিম্ন ১টি করে আসন লাভ করে। জাতীয় সংসদের ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন বি.এন.পি-কে অতিরিক্ত ২৮টি আসন প্রদান করে এবং জামাতে ইসলামী লাভ করে বাকি ২টি আসন। ফলে বি.এন.পি'র সর্বমোট আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৯টি এবং জামাতে ইসলামীর হয় মোট ২০টি আসন।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বি.এন.পি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সময় সরকার গঠনের প্রশ্নে বি.এন.পি ও জামাতে ইসলামীর মধ্যে একটি 'অপ্রকাশ্য বা গোপন সমঝোতা' হয়। জামাতে ইসলামী সরকার গঠনের প্রশ্নে বি.এন.পি-কে সমর্থন দান করায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদ ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ তারিখে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ বি.এন.পি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ১১ জন মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রীসহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেন।[১২]

৩.২ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার
Caretaker Government of 1996

১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে 'সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী'র মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ

১১. বাংলাদেশ টাইমস, ২ মার্চ, ১৯৯১।
১২. দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক স্বীকৃতির পিছনে ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সুদীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলের দীর্ঘ আড়াই বছরের নিরন্তর আন্দোলন ও সংগ্রামে ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, সচিবালয় অচল হয়ে পড়ে, সরকারের সঙ্গে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে এবং জনজীবন দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে বি.এন.পি. সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।[১৩]

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ডাকে। এক সপ্তাহ স্থায়ী এ অধিবেশনে মাত্র চারটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ থেকে ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত শেষ বৈঠকে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। এ বিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের বিধান করা হয়, যা ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।[১৪] ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন বি.এন.পি. সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

৩.২.১ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন
Formation of Non-party Caretaker Government

১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ রাতে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহন করেন।[১৫] শপথ গ্রহনের পর প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে তার প্রথম ভাষণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ১৯৯৬ সালের ৩ এপ্রিল দেশের ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[১৬] প্রধান উপদেষ্টা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ নিজ হাতে রেখে অন্যান্য উপদেষ্টার মধ্যে নিম্নোক্তভাবে দপ্তর বন্টন করেন ঃ[১৭]

---

১৩. ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৮, পৃঃ ২৬৩।
১৪. ডঃ আবুল ফজল হক, ঐ, পৃঃ ২৬৩-৬৪।
১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ এপ্রিল, ১৯৯৬।
১৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।
১৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

উপদেষ্টাদের নাম	মন্ত্রণালয়ের নাম
১। ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়।
৩। অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক	ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি
৪। শেওফতা বখত চৌধুরী	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পাট বস্ত্র মন্ত্রণালয়
৫। এ জেড এম নাসিরুদ্দিন	কৃষি, খাদ্য, মৎস ও পশু সম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও ভূমি মন্ত্রণালয়
৬। মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রহমান খান	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রাণালয়।
৭। ডক্টর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।
৮। সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী	যোগাযোগ, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯। ডক্টর নাজমা চৌধুরী	শ্রম, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১০। ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান ১৩ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধান বহির্ভূত বা আইন বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করবে না। দেশে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনকে সামনে রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথমত দেশ হতে সন্ত্রাস দূর করতে এবং দ্বিতীয়ত এক ধরনের ন্যূনতম ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে সচেষ্ট হবে। প্রয়োজনবোধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কর্তব্য পালন করতেও দ্বিধা করবে না।"[১৮]

১৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম
Activities of the Caretaker Government

১৯৯৬ সালের বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার মেয়াদকাল ছিল ৮৫ দিন। এ ৮৫ দিনের ক্ষুদ্র পরিসরে কোন সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা মুল্যায়ন করাও কঠিন কাজ। তাছাড়া আইন করে বেঁধে দেয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ। কেননা কোন কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা থেকে এ সরকারকে আইন দিয়ে শৃংখলিত করা হয়েছিল। তাছাড়া ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রেখে দেয়া হয়েছিল রাষ্ট্রপতির হাতে। তাই হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে সন্ত্রাস বন্ধের মাধ্যমে নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ দানে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাই তিনি তার প্রথম ভাষণে বলেছেন, "অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে সন্ত্রাস বন্ধ করা তাদের প্রধান কাজ।" ফলে ১৯৯৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে সারাদেশে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকির মুখেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। এ অভিযানে পূর্ণ সফলতা লাভ না করলেও যতটুকু সাফল্য লাভ ঘটেছে তার ফলেই অনেকটা শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে।

আসন্ন নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে গুরুত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করার জন্য অনুরোধ জানান। তার সরকারের শাসনামলে সন্ত্রাস, ছিনতাই, অপহরণ, নির্যাতন অনেকটা কমে গিয়েছিল। নাগরিক জীবনে অনেকটা স্বস্তি ফিরে এসেছিল। যানজট কমে এসেছিল। চাঁদাবাজি কমে এসেছিল। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনের পর হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনের সাথে সাথে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে।[১৯]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব থেকে কঠিন পরীক্ষার সন্মুখীন হয়েছিলেন প্রশাসনিক রদবদল করতে গিয়ে। কেননা দীর্ঘদিন থেকে একই কর্মস্থলে রয়েছেন এমন কিছু ডি.সি., এস.পি., টি.এন.ও.-দের বদলি করার পদক্ষেপ নিলে বিএনপি এর বিরোধিতা করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ চাচ্ছিল প্রশাসনের ব্যাপক রদবদল করা

১৯. ডঃ মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৬২৩।

Dhaka University Institutional Repository

হোক। তাছাড়া বিএনপি বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যেসব উচ্চপদস্থ আমলা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দলের মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিয়েছেন তাদেরকে চাকরিচ্যুত বা শাস্তি প্রদানের জন্য বিএনপি দাবি জানায়। দু'পক্ষের চাপের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে খুব চিন্তা ভাবনা করে এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করতে হয়েছিল, যাতে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়।

তাই প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রশাসনিক পর্যায়ে তেমন কোন রদবদল না ঘটিয়েই প্রশাসনকে নির্বাচন পরিচালনার আস্থাভাজন করে তোলেন। সচিবদের উদ্দেশ্যে দেয়া তার একটি বক্তব্যের অংশ বিশেষ এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য "দেশে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যে কোন হাওয়া বদল হোক না কেন, কর্ম বিভাগের শীর্ষে হয় সচিব হিসেবে বা অন্য কোনভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা অবস্থান করছেন তাদের গুরুদায়িত্ব হচ্ছে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। সাম্প্রতিককালের কোন ঘটনার দ্বারা তাড়িত বা প্রভাবিত হয়ে কোন অসতর্ক মূহুর্তে আপনারা এমন কিছু করবেন না, যার ফলে দেশের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় কিছু সরকারি কর্মচারীর অতিরিক্ত সংস্রব গড়ে উঠেছে। ১৯৪৫-৪৬, ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৭৩ বা ১৯৯১-এর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এক নয়। বর্তমানকালের পরিস্থিতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসার অপেক্ষা রাখে, সেই মীমাংসা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হওয়া উচিত।"[২০]

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পর নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করে। তবে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে গিয়েও এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই কোন সৎ, নির্লোভ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিই প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে চান নি। কেননা, অতীতে প্রধান নির্বাচন কশিশনারগণকে নিরপেক্ষ থাকতে দেয়া হয় নি। অতীতে বিচারপতিগণই প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার উচ্চপদস্থ আমলা মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন। ১৯৯৬ সালের ৯ এপ্রিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মোহাম্মদ আবু হেনার নিয়োগ ও শপথ গ্রহনের ফলে নির্বাচন কমিশনে আবার

২০. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসতে থাকে। নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার বলেন, তার সর্বাপেক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ হবে সমগ্র জাতির কাঙ্খিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা।[২১]

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র ১২ সপ্তাহের শাসনামলে একটি বাজেটও পেশ করেছিল। এ বাজেটে প্রয়োজনীয় খাতগুলোতে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও, অপ্রয়োজনীয় খাতগুলোতে বরাদ্দ কমানো হয়েছিল এবং কৃচ্ছ্রতা সাধনের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ বাজেটে নতুন কোন কর আরোপ করা হয় নি।

এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বড় সাফল্য হলো ১২ জুন একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও কারচুপিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান। এ নির্বাচনে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করে এবং ভোটের মাত্রা অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এ নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জনাব হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। এ নির্বাচন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশী-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১২ জুন একটি সফল, কারচুপিবিহীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে প্রমাণ করেন যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহৎ হলে এদেশেও ভালো কিছু করা সম্ভব।

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেন ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন। এদিন নতুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ নেয়ার সাথে সাথেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। এর ফলে ক্ষমতার কন্টকাকীর্ণ বৃত্ত থেকে সরে দাঁড়ান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিদায় নেন ১১ জনের একটি নিরপেক্ষ ও নির্মোহ পরিবার।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে নির্বাচনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বল্প সময়ে যা করে গেছেন তার তুলনা নেই। বালাদেশের জনগণ বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। এমন দিন হয়ত খুব দূরে নয় যখন অনেক দেশই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে সাদরে গ্রহন করবেন।

---

২১. দৈনিক লালসবুজ, ১০ এপ্রিল, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৩ ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Seventh Jatiyo Sangsad Election of 1996

১৯৯৬ সালের ১২ জুন তারিখে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফল অনুসারে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে প্রথম স্থানে অবস্থান করে। অণ্যদিকে বি.এন.পি. লাভ করে ১১৬টি, আর জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩২টি আসন। এ ছাড়া জামাতে ইসলামী ৩টি, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি, জাসদ (রব) ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ১টি আসন লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩০টির মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৭টি আসন লাভ করে। বাকি ৩টি আসন পায় জাতীয় পার্টি। ফলে আওয়ামী লীগের সর্বমোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৩টি এবং জাতীয় পার্টির ৩৫টি আসন। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগে যোগদান করায় মোটসংখ্যা হয় ১৭৪টি।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেন।[২২] একই দিন তার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শেখ হাসিনা তার সরকারকে 'ঐকমত্যের সরকার' বলে অভিহিত করেন। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহনের সাথে সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ১৯৯৬ সালের ২৯ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেয়।

৩.২.৪ ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব
Importance of the Seventh Jatiyo Sangsad Election of 1996

১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্বাচন। বেশ কয়েকটি কারণে এ নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে এ নির্বাচনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হল ঃ

১। **বিপুল সংখ্যক ভোটারের অংশগ্রহন ঃ** অতীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর মধ্যে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা বেশি ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের পরিমান ছিল শতকরা ৭৫.৬১ ভাগ।

---

২২. দৈনিক সংবাদ, ২৪ জুন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

২। **শান্তিপুর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ঃ** ১৯৯৬ সালের এ নির্বাচনে এত বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার একটি বড় কারণ ছিল এর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খলার সাথে সাধারণ মানুষ বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছিল, এ নির্বাচন ছিল তার ব্যতিক্রম। এক কথায়, এ নির্বাচনে পরিবেশ ছিল অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ।

৩। **অধিক সংখ্যক দলের অংশগ্রহন ঃ** ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহন করে। এ নির্বাচনে সর্বমোট ৮১টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী অধিক আসন লাভ করে।

৪। **ঋণখেলাপিরা অংশগ্রহনে অপারগ ঃ** ঋণখেলাপিরা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারে নি। ঋণখেলাপি বলে ঘোষিত যে সব ব্যক্তিকে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল, নির্বাচন কমিশন তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করে।

৫। **গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঃ** বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপযুক্ত ভিত্তিমালা তৈরীর অব্যাহত প্রচেষ্টায় ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ নির্বাচনে গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল গণতন্ত্রের মাইলফলক

৬। **পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট ঃ** বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ১১টি গ্রুপ ১৯৯৬ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষন করার জন্য ঢাকায় আসেন। এ ১১ টি গ্রুপে মোট পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৪৫ জন। তবে দেশী-বিদেশী প্রায় ৩৫ হাজার এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষক সকলেই অভিমত প্রদান করেন যে, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৯৬ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ নির্বাচন ছিল সবচেয়ে নিরপেক্ষ, অবাধ ও কারচুপিবিহীন। কেননা নির্বাচনী আচরণবিধিতে এ নির্বাচনে অনেক নতুন নিয়ম ও কড়াকড়ি শর্তারোপ করা হয়েছিল। এ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে শ্রম দিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবিদার।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা
A Comparative Study Between Caretaker The Governments of 1990 and 1996

বাংলাদেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর, আর দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্মরত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদের নেতৃত্বে ১৭ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হয়। দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হয়।[২৩] নিচে ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথমত ঃ বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্দোলনরত বিরোধীদল ও জোটগুলোর ঘোষিত যৌথ ঘোষণার[২৪] (১৯ নভেম্বর, ১৯৯০) ভিত্তিতে। অন্যদিকে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। কর্মরত প্রধান বিচারপতি থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন কর্তৃক প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি ও পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার ফলে সংবিধানের যে লংঘন করা হয়, তার সাংবিধানিক বৈধতা প্রদানের জন্য পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী (সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে ২১ নং ধারা সংযোজন) উত্থাপন ও পাশ করা হয়। এ সংশোধনীটি ১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদের সরকার বা প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল রাষ্ট্রপতিক, বিপরীতে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকার বা দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল সংসদীয় পদ্ধতির। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ব্যক্তি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। তাই কারও কাছে তার জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা ছিল না। অন্যদিকে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ব্যক্তি শুধুমাত্র সরকারপ্রধান। তিনি তার উপদেষ্টাপরিষদের সকল সদস্যসহ যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী ছিলেন।

---

২৩. তারেক এম. টি. রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৫৩।

২৪. Mohammad A. Hakim, Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum, University Press Limited, Dhaka, 1993.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত ঃ প্রথম সরকারকে সাংবিধানিকভাবে (একাদশ সংশোধনীর আওতায়) 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করাহয়। দ্বিতীয় সরকারকে সংবিধান 'নির্দলীয় সরকার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আওয়ামী লীগসহ বিরোধীদলগুলো 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করেছিল এবং সংবিধান সংশোধনীর পরও দলগুলো, বিশেষত আওয়ামী লীগ[২৫] দ্বিতীয় সরকারকে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বিএনপি কার্যত গোড়া থেকেই বিরোধীদলের 'নিরপেক্ষ সরকারের' ধারণার সাথে দ্বিমত ঘোষণা করেছিল এবং এ দলটির উদ্যোগে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল প্রস্তাবিত ও পাশ হয়, তখন 'নিরপেক্ষ' শব্দটিকেও দলটি সচেতনভাবে পরিহার করেছে।[২৬]

চতুর্থত ঃ ১৯৯০ সালের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিরক্ষাসহ রাষ্ট্রের সমুদয় নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করেন। অপরদিকে ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকায়, ১৯৯৬ সালের দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন নি।

পঞ্চমত ঃ প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যসংখ্যার কোন বাধকতা ছিল না। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন 'কয়েক দফায়' ১৭ জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে একজন প্রধান উপদেষ্টা ও 'অনধিক দশজন' উপদেষ্টার নির্দিষ্ট বিধান সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে রাখা হয় [৫৮-গ(১১) অনুচ্ছেদ] ।

ষষ্ঠত ঃ ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাহী ক্ষমতাপ্রয়োগ, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বড় কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের সন্মুখীন হতে হয় নি। তবে, দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের দাবির মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদের দল জাতীয় পার্টিকে প্রচারের ক্ষেত্রে রেডিও-টিভি সম্প্রচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে প্রথম সরকার। এজন্য দলটি প্রথম সরকারকে অভিযুক্ত করেছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ফলাফল দেখে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা যদিও 'সূক্ষ্ম কারচুপি'র অভিযোগ তুলেছিলেন, তবে কার্যত এ অভিযোগটি সরাসরি প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল অন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি।

---

২৫. দৈনিক সংবাদ, ৭ এপ্রিল, ১৯৯৬, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আয়োজিত 'বিজয় সমাবেশে' হাসিনার ভাষণ।
২৬. তারেক এম. টি. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রথম অবস্থা থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠতে থাকে । দ্বিতীয় সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা বিগত আন্দোলনের সাথে ছিলেন না, বরং বি.এন.পি.-কে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছেন।"[২৭] এছাড়া এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে অন্যতম বড় দল বি.এন.পি. পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে। এ পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নটি আসে 'আওয়ামী লীগপন্থী' আমলাদেরকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদে আসীন করা নিয়ে।[২৮]

সপ্তমত ঃ দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটো সাধারণ নির্বাচনকেই দেশি-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সাধারণভাবে সন্তোষজনক মাত্রায় অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে মূল্যায়িত করেছেন। তবে পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলার সুযোগ থাকবে যে, দ্বিতীয় সরকারের আলে নির্বাচনে বেশিসংখ্যক ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষ হয়েছে ও নির্বাচন স্থগিত হয়েছে, বেশিসংখ্যক মানুষ আহত ও নিহত হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফলের পর বেশিসংখ্যক আসনের কেন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি যথেষ্ট সাধারণীকৃত, স্বীকার করতে হয়।[২৯]

অষ্টমত ঃ ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হলেও, এ সরকারের গঠন ও কার্যকারিতা নিয়ে জটিলতা ছিল কম। কারণ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই ছিল জটিলতার সম্মুখীন।

সবশেষে বলা যায় যে, ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পার্থক্য থাকলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে - উভয় সরকারেরই মূল লক্ষ্য ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

---

২৭. দৈনিক সংবাদ, ৫ এপ্রিল, ১৯৯৬,
২৮. তারেক এম. টি. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪।
২৯. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ও ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

Democratization in Bangladesh and the Role of Caretaker Government of 1996

প্রাচীনকাল থেকে আজকের একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৃথিবীব্যাপী যে সমস্ত সরকার পদ্ধতি, শাসন পদ্ধতি ও নির্বাচন পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়ে আসছে, তার সবই একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত। এ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে গণতন্ত্র যৌক্তিকভাবেই একটি গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। বিগত শতকে রাষ্ট্র পরিচালনা বা শাসন পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রের পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এ তিন পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে গণতন্ত্র আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের পরে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা ধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। তারই ফলে বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্জনের সংগ্রাম অব্যাহত।[১]

মেগ গ্রীনফিল্ড (Meg Greenfield) বলেছেন, "Everybody's for democracy in principle. It's only in practice that the things gives rise to stiff objectives." অর্থাৎ নীতিগতভাবে সবাই গণতন্ত্রের পক্ষে। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে কেবল দেখা যত বিপত্তি। বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রকে মনে প্রাণে লালন করে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ চেয়েছে তাদের মুক্তি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গত ৩৬ বছরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির যতটা বিকাশ হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, এক জন অন্যজনকে সহ্য না করার মানসিকতা এবং সর্বোপরি 'কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স'-এর অভাব আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশকে বারে বারে বাঁধাগ্রস্ত করেছে।[২]

---

১. এম.সাইফুল্লাহ্ ভূইয়া ও মোঃ ফয়সাল, নির্বাচন ও গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃঃ ৮৫।

২. তারেক শামসুর রেহমান, গণতন্ত্র সুশাসন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ভূমিকা অংশ, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।[৩]

বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখা।[৪] আর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের এ অগ্রযাত্রায় এক নবতর মডেল হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে এ সরকারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। এ সরকার বাংলাদেশে গণতন্ত্রের দ্বারকে নতুনভাবে উন্মোচিত করেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামকে ফলপ্রসূ করার তাগিদে অর্থাৎ গণতন্ত্রকে সুসংহত বা সমুন্নত রাখতে এ সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তবে এক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে ১৯৯৬ সালের বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

৪.১ গণতন্ত্রায়ন
Democratization

একবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক উন্নয়নের সর্বশেষ শর্ত হিসেবে গণতন্ত্রায়ন শর্তটি খুবই প্রাধান্য পায়। গণতন্ত্র (Democracy) হলো একটি আদর্শ, আর একে বাস্তবায়নের যে প্রক্রিয়া (Process) তা হলো গণতন্ত্রায়ন (Democratization)। অর্থাৎ গণতন্ত্রায়ন হলো গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চলমান ধারা। এটি একটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নিজের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বজায় রেখে চলে। মোটকথা, যখন কোন একটি দেশ গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এর স্বাভাবিক যাত্রা অব্যাহত রাখে, তখন দেশটি গণতন্ত্রায়নের মধ্যে দিয়ে চলে। নিম্নে এ সম্পর্কে কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ

---

৩. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, গণতন্ত্র, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রচর্চা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ৯৫।

৪. তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, গণতন্ত্র, কার্যকর সংসদ, সরকার ও বিরোধী দল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

জর্জ মডেলস্কি (George Modelski) বলেছেন, "Democratization is the process by which democracy spreads across the world."[৫]

ড. আতাউর রহমান (Dr. Ataur Rahman)-এর মতে, "Democratization is a process through which people exercise their right of franchise in an open and competitive elections and participate in the decision making process of the government."[৬]

স্যামুয়েল পি. হানটিংটন (Samual P. Huntington) বলেছেন, "Democratization differs substantially from one place to another and one time to another."[৭]

সুতরাং যখন একটি দেশে আইনের শাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সামাজিক শান্তি ইত্যাদি আসবে, তখনই একটা দেশে গণতন্ত্রায়ন আসবে। তাই বলা যায় যে, গণতন্ত্রায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যখন কোন একটি দেশের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং তারা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করতে পারে।

৪.২ গণতন্ত্রায়নের উপাদান
Factors of Democratization

গণতন্ত্রায়নের উপাদানসমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ ১. প্রাতিষ্ঠানিক গঠন এবং ২. নেতৃত্ব। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. প্রাতিষ্ঠানিক গঠন (Institutional Building)ঃ গণতন্ত্রায়নের উপাদান হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক গঠনকে তিনটি দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। যথাঃ

(ক) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পরিবেশের সৃষ্টি (Creation of Democratic Values and Environment) ঃ এর ভিতর যে সকল বিষয় লক্ষণীয় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

---

৫. George Modelski, Encyclopedia of Government and Politics.

৬. Dr. Ataur Rahman, Challenges of Governance in Bangladesh, BIISS Journal, Dhaka, Bangladesh Institute of International and Strategic Stadies, Vol. 14, No. 4, October, 1993.

৭. Samual P. Huntington, The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1991, P. 262.

Dhaka University Institutional Repository

১. স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

২. অন্যের মতামতকে সহ্য করার ক্ষমতা।

৩. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।

৪. সংবাদপ্রত্রের স্বাধীনতা।

৫. বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি সহিষ্ণুতা।

৬. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

৭. গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সর্বজনীন আস্থা।

৮. জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ।

(খ) গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা (Establishment of Democratic Political System)ঃ এ বিষয়টি কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে । যেমন ঃ

১. রাষ্ট্রকর্তৃক গ্রহনযোগ্য পন্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান।

২. নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান।

৩. ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির পূর্ণ অনুশীলন।

৪. জাতীয় সংসদের অধিকতর কার্যকরভাবে ও দ্রুততার সাথে কার্য পরিচালনা।

৫. রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামো ও কার্যাবলির মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা।

(গ) জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণের অধিকার ও অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা (Ensuring the Right and Participation of People in all Spheres of National Life) ঃ গণতন্ত্রায়নের একটি শর্ত হচ্ছে জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্টীয় কর্মকান্ডে, উন্নয়ন পরিকল্পনায়, সিদ্ধান্ত গ্রহন ও নীতি প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের এ সমস্ত গতিশীল ও অর্থপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার উপর গণতন্ত্রায়নের অস্তিত্ব র্নিভর করে। বাংলাদেশ পলিটিক্যাল সাইন্স রিভিউ (Bangladesh Political Science Review) -এ বলা হয়েছে যে, "The success or failure of democratization process depends

Dhaka University Institutional Repository

upon its wave or struggle in different times and the participant peoples and organizations."[৪]

২. নেতৃত্ব **(Leadership)** ঃ একটি দেশের গণতন্ত্রায়নে নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রয়োজন। নেতৃত্ব এমন একটি সদ্গুণ, যার উপর নির্ভর করে একটি দেশের জনগণ কতটুকু গণতান্ত্রিক মনমানসিকতা সম্পন্ন। একজন ভালো নেতার নেতৃত্বেই সে দেশের গণতান্ত্রিক চর্চ্চা হয় আশানুরূপ। তাই বলা যায়, একজন সুদক্ষ নেতার নেতৃত্ব ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ঠিকভাবে চলতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) বলেন, "Effective leadership is a great tonic for achievement of political stabilization in the state leading to haring democratization for the citizen."

আবার ডঃ আতাউর রহমান (Dr. Ataur Rahman)-এর মতে, " Today the region needs a different breed of political leadership who can run the institutions of democracy as Prime Minister or leader of the opposition less exalted but more effective."[৯] তিনি আরও বলেন, "political leadership has an added significance to the process of democratization."[১০]

৪.৩ গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার
Democracy and Caretaker Government

গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের জন্য যেসব জাতির খ্যাতি রয়েছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব জাতি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং রক্ত দিয়েছে সেসব দেশের তালিকায়ও বাংলাদেশের নাম শ্রদ্ধার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

---

৮. Arun Kumer Goswami, The Grits of Democratization in Bangladesh, Bangladesh Political Science Review, Vol. 1, No. 1, June, 2001, P. 138.

৯. Dr. Ataur Rahman, Democratization in South Asia : Bangladesh Perspectives, Bangladesh Political Science Review, Vol. 1, No. 1, June, 2001, P. 11.

১০. Dr. Ataur Rahman, Ibid, P.11.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।[১১] বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। আর গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পূর্বশর্ত হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ও জবাবদিহিতামূলক একটি সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তারই ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চাকে সুসংহত করার তাহিদে প্রবর্তিত হয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের ন্যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন ও বহুমাত্রিক ধারণা। যে কোন দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে চারটি বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো ঃ

১. নিয়মিত অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন,

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা,

৩. গণ-মাধ্যমগুলোর মুক্ত প্রবাহের অধিকার এবং

৪. নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা।

উল্লেখিত চারটি প্রধান স্তম্ভকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, গণতন্ত্রের ভারসাম্যতা বজায় থাকে। সত্যিকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। আর যেহেতু গণতন্ত্রের মূল বিষয় প্রতিশব্দ 'নির্বাচন'কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত, তাই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্যই প্রণীত হয়েছে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকাকে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বলা যায় - সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রধান রূপকার, যা বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নের পথে প্রধান ভূমিকা পালন করতে সহায়ক।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বা ত্রয়োদশ সংশোধন আইন একটি অনন্য এবং অভুতপূর্ব আইন। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত রিট পিটিশনের শুনানিতে অবদুর রাজ্জাক বলেন, "ত্রয়োদশ সংশোধনী দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা ও

১১. তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, গণতন্ত্র, কার্যকর সংসদ, সরকার ও বিরোধী দল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপদ করেছে।" তিনি বলেন, আলোচ্য সংশোধনী গণতন্ত্রের সহায়তাকারী হিসেবে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্যই এ আইন। এতে জনগণের মন-মানসিকতা, রাজনৈতিক দল ও সরকারের ভূমিকাই মুখ্য। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের বৃহত্তম বেঞ্চের দেয়া রায়ে বলা হয়, "এ সংশোধনীতে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সাথে সংঘর্ষপূর্ণ কোন উপাদান নেই। এ সংশোধনী সংবিধানের মূল ভিত্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করেছে।" আদালত তার রায়ে আরও বলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি রাজনৈতিক সরকার নির্বাচনের রায়কে নিজেদের পক্ষে আনতে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করে।" তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংবিধানে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদালত বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সবশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থায়ী বিধান করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। তবে গণতন্ত্র এমন কোন পরিশুদ্ধ, নির্ভুল, পরিপক্ক ও পরিণত রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, যা চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। গণতন্ত্র হলো পরীক্ষালব্ধ ও নবতর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যক্তিস্বাধীনতার যৌথ প্রকাশ। যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তি মানুষের আধিপত্য বা কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সৃষ্টি হয়। তথাপি এ ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গ্রহনযোগ্য করে তুলতে হলে জনগণের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোরও সম্মিলিত প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিফলন একদিন আন্তর্জাতিক স্তরে মডেল হিসেবে পরিগণিত হবে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা
The Role of Caretaker Government in Democratisation of Bangladesh

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাষ্ট্রে দু'টি অংশ রয়েছে। একটি সরকার ব্যবস্থা এবং অপরটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রতিফলিত হয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যকর হয়। কিন্তু সরকার ব্যবস্থা যদি অগণতান্ত্রিক হয়, তবে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে দলীয় প্রবণতা বিস্তৃত হয়। এ বিস্তৃত করার প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দিকে হাত বাড়ানো হয়। ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। বিগত ২৫ বছর ধরে কমবেশী তাই করা হয়েছে। এ কারণেই স্বাধীনতার ২৫ বছর পরও জাতি হিসেবে আমাদের অবস্থার কোন উত্তরণ ঘটে নি। এ জন্য দরকার ছিল গণতন্ত্রের অনুশীলন, দরকার ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা।

আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার অগ্রগণ্য ও প্রথম শর্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা, কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে। আর নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়া মানে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সাধারণ জনতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে যা গণতন্ত্রের অনতম লক্ষ্য। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে অনুযোজিত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা আলোচনা করা হলো ঃ

১. **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন** ঃ একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উপযুক্ত ভিত্তি তৈরির অব্যাহত প্রচেষ্টায় এ সরকারের গুরুত্ব অতুলনীয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ সরকারের ভূমিকাকে একটি মাইলফলক বলা যায়। তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সুশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল সর্বস্থানে। এটা সম্ভব হয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণে। তাই বলা যায়, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংরক্ষিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. **সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশে আর কোন সংসদ নির্বাচন এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই এ নির্বাচন সারা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাই এ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ব্যবস্থার সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল বলা যায়।

৩. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটেছিল। নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সৃশৃঙ্খল হয় সেজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ, র‍্যাব, বিডিআর, সেনাবাহিনী ও আনসার বাহিনীকে ব্যবহার করেছিল।

৪. **গণরায়ের প্রতিফলন ঃ** ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দেশের জনগণ নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে ভোট প্রদান করার সুযোগ পায়। ফলে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি জনগণের সমর্থন কতটুকু তা সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে জনমতের এরূপ প্রতিফলন দেশের পক্ষে খুবই কল্যাণকর।

৫. **অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও ব্যবহার রোধ ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহন করার পর থেকে পুলিশ প্রশাসনকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত করেন। নির্বাচনে কেউ যাতে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে ভোট ছিনতাই করতে না পারে, সে ব্যাপারে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

৬. **রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিমালা প্রচার ঃ** রাজনৈতিক দলগুলো যাতে তাদের দলীয় আদর্শ ও নীতিকে জনগণের সামনে পেশ করতে পারে, সে জন্য ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার টেলিভিশনের মাধ্যমে সে সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করে। আবার প্রত্যেক দলকে রেজিস্ট্রেশন করতে বাধ্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. **বিদেশী পর্যবেক্ষকদের আগমন ঃ** নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে কি-না, তা পর্যবেক্ষণ করতে বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকরা আসেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ইতিবাচক কার্যকারিতাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও গ্রহনযোগ্য করে তুলে । উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে ১১টি বিদেশী পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এসেছিল।

৮. **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি ঃ** গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশ্বব্যাপী জয়জয়কারের মূল কারণগুলোর দু'টি হলো স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা, যা এ দেশে বরাবরই উপেক্ষিত ছিল। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বোধ তৈরির ক্ষেত্র বিনির্মাণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে একটি গণরায় হিসেবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৯. **প্রশাসনিক রদবদল ঃ** নির্বাচনী কাজে এবং নির্বাচনী প্রচারণায় কেউ যাতে পেশীশক্তি ও দলীয় প্রভাব কাজে লাগাতে না পারে, সে জন্য ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাময়িক রদবদল করে, পুলিশ প্রশাসনকে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করেন। এতে প্রজাতন্ত্রে অনেকাংশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

১০. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন ঃ** ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করা। এ দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালের এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অত্যন্ত প্রশংসিতভাবে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে।

১১. **রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সহায়তা ঃ** ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সহায়তা করে। কারণ এ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বি.এন.পি.-এর পরাজয় ঘটে এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের বিজয় সূচিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ ২১ বছর পরে দ্বিতীয় বারের মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২. **শক্তিশালী সরকার গঠনে সহায়ক ভূমিকা ঃ** ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের অভিনন্দন জানিয়ে সরকার গঠনে সহায়তা করে এবং প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার ইতি টানেন। একটি শক্তিশালী সরকার গঠনে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৩. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** গণতন্ত্রের মৌল উপাদান মূলত পাঁচটি, যথা ঃ সাম্য, গণসার্বভৌমত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আইনের শাসন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে নজিরবিহীন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

১৪. **সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা ঃ** সিভিল সমাজ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু দীর্ঘ পনের বছরের সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বসেছিল। সিভিল সমাজকে প্রতিষ্ঠা দান ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অতিস্বীকার্য।

বাংলাদেশ পলিটিক্যাল সাইন্স রিভিউ (Bangladesh Political Science Review) -এর এক জার্নালে বলা হয়েছে যে, "The most important aspect of Bangladesh democracy is provision for caretaker government. The members of the caretaker government are actually the members of the civil society. Though the duration of caretaker government is only for three months in every five years, still it indicates more responsible behaviour of the members of the civil society than the political party leaders. But due to many other constraints the civil society can not play expected role in democratization process."[12]

---

১২. Arun Kumer Goswami, The Grits of Democratization in Bangladesh, Bangladesh Political Science Review, Vol. 1, No. 1, June, 2001, P. 145.

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করতে ১৯৯৬ সালের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে মন্তব্য বরতে গিয়ে বিদেশী নির্বাচনী পর্যবেক্ষকগণ বলেন, "The non-party caretaker government of 1996 did a miracle in the democratic process of Bangladesh." বিশেষকরে, বাংলাদেশের শিশু গণতন্ত্রের জন্য ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচন ও বাংলাদেশ
Election and Bangladesh

গণতন্ত্রে জনগণ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকারী।[১] গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহনকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকে।[২] অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটান। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন এবং সরকার গঠনে অংশগ্রহন করে থাকে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে যে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বস্তরে ভোটাধিকার ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই আধুনিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

নির্বাচন ও নির্বাচন ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতি ও গণতন্ত্রের চড়াই উৎরাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭৩ হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ের নির্বাচনের ইতিহাস বিশ্লেষণে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিস্কার যে, বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান বরাবরই রাজনৈতিক ও ক্ষমতাকামী ব্যক্তির কাছে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ও আগ্রহের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এর কারণ বহুবিধ। তবে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠার অভাব সভ্যতা ও অগ্রগতির পথে এ অঞ্চলের মানুষকে যেমন এগুতে দেয় নি, তেমনি নির্বাচন অনুষ্ঠানকেও অর্থবহ করে নি। নিঃসন্দেহে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো টিকিয়ে রাখার ও তার বিকাশের জন্যে অপরিহার্য শর্ত।[৩]

---

১. K. C. Wheare, Modern Constitution, PP. 89-91., উদ্ধৃত ঃ মিজানুর রহমান খান, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৪০।

২. Karl Loewenstein, British Cabinet Government, Oxford University Press, New York, 1967, P. 1X.

৩. তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, তারেক শামসুর রেহমান ও মিজানুর রহমান খান, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩ - ১৯৯৬, পৃষ্ঠাঃ ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা
Electoral System of Bangladesh

বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২(১)নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে, "প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।"[৪] তাই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে বিশ্বের দরবারে যেহেতু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত, তাই বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা সুষমামন্ডিত। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **গণতান্ত্রিক ভিত্তি ঃ** বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। গণতান্ত্রিক বাবধারা ও কাঠামো সচল রাখার লক্ষ্যে এ দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানব সত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে।"

২। **সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি ঃ** বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি। নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক (আঠারো বছর বয়স্ক) নাগরিক ভোটদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকারী।

৩। **অভিন্ন ভোটাধিকার তালিকা ঃ** প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা থাকবে। এ তালিকা ব্যতিরেকে অন্য কোন তালিকা গৃহীত হবে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকায় একটি করে ভোটার তালিকা থাকবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না।[৫]

---

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকা, পৃঃ ৯৯।
৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকা, পৃঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪। **সম ভোটাধিকার নীতি ঃ** বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ভোটদানের অধিকার সমান থাকবে। সকলেরই একটি মাত্র ভোট থাকবে। অর্থাৎ একটি নাগরিকের জন্য 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি প্রচলিত থাকবে।

৫। **ভোটদান পদ্ধতি ঃ** ভোটদান করা প্রত্যেক নাগরিকের আবশ্যিক কর্তব্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বত্র এ অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। যে পদ্ধতির মাধ্যমে ভোটারগণ তাদের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট প্রদান করেন তাকে ভোটদান পদ্ধতি বলে। বাংলাদেশের ভোটদানের পদ্ধতিকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ সরল ভোটদান পদ্ধতি এবং গোপন ভোটদান পদ্ধতি।

(ক) গোপন ভোটদান পদ্ধতি ঃ যে পদ্ধতিতে ভোটারগণ তাদের মনোনীত প্রার্থীকে গোপনে ব্যালট পেপারে সংকেতের মাধ্যমে ভোট প্রদান করে তাকে গোপন ভোটদান পদ্ধতি বলা হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রায় সকল নির্বাচন গোপন ব্যালট পত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিতে নির্বাচকমন্ডলী তাদের পছন্দ অনুযায়ী সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করতে পারেন। নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রের বুথে বেষ্টনী দিয়ে ভোটারদের ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়।

(খ) সরল ভোটদান পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের ভোটদান পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রকৃতির। প্রত্যেক ভোটার প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্মিলিত ব্যালট পত্রে ভোটারগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীল ব্যবহার করেন। এতে ভোট গণনা কাজে সুবিধা হয়।

৬। **নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** যে পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন হয় তাকে নির্বাচন পদ্ধতি বলে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতিগত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যথাঃ (ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ও (খ) পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। বাংলাদেশেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় নির্বাচন পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) **প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্যগণ সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি নিয়োগ এবং জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যদের নির্বাচন ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বস্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

(খ) **পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ৪৫ জন মহিলা সদস্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে।

৭। **নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ ঃ** বালাদেশের নির্বাচনকে সুষ্ঠু, সুন্দর এবং নিরপেক্সভাবে সম্পাদনের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করা এয়। জনসংখ্যার সমতার নীতি অনুযায়ী গোটা বাংলাদশেকে একক প্রতিনিধি নির্বাচনী এলাকায় পরিণত করা হয়। এবং প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি জাতীয় সংসদেদ সদস্য নির্বাচিত হয়।

৮। **নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান ঃ** বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে নিবমিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সদসদের সদস্যরা নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্ষমতায় আসীন থাকেন। মেয়াদান্তে নির্দারিত সময়ে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে কোন কারণে যদি অসন শূন্য হয়, তবে নির্ধারিত সময়ে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করতে হবে। বাংলাদেশ সংবিধানে ১২৩ নং ধারার উপধারা ১(৩)-এ বলা হয়েছে যে, মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আবার উপধারা ৮এ বলা হয়েছে সয়সদ ভেঙ্গে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সয়সদের কোন সদস্য পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৬]

---

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকা, পৃঃ ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

৯। **নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ঃ** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার একমাত্র সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। দেশের স্থানীয় শায়িত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে এবং জাতীয় পর্যায়ে যে কোন নির্বঅচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বঅচন কমিশনের উপর ন্যাস্থ। বাংলাদেশ সংবিধানে ১১৮ (১) ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করবেন সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে।[৭]

৫.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহ (১৯৭৩ - ১৯৯৬)
Jatiyo Sangsad Elections of Bangladesh (1973 – 1996)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট ৭ (সাত) বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সংসদ নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী নিচে বিশ্লেষণ করা হলো ঃ[৮]

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকা, পৃঃ ৯৯।
৮. বংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.১

এক নজরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহ (১৯৭৩-১৯৯৬)

নির্বাচন ও সময়	মোট দলের সংখ্যা	মোট প্রার্থী	মোট ভোটার	ভোটদানকারী ভোটার	গৃহীত মোট ভোটের শতকরা	বৈধ ভোটের শতকরা অংশ	অবৈধ ভোটের শতকরা অংশ
১ম সংসদ নির্বাচন ৭ মার্চ, ১৯৭৩	১৪	১২০৯	৩৫২০৫৬৪২	১৯৩২৯৬৮৩	৫৪.৯১	৫৩.৫৫	১.৩৬
২য় সংসদ নির্বাচন ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯	২৯	২৫৪৭	৩৮৩৬৩৮৫৮	১৯৬৭৬১২৪	৫১.২৯	৫০.২৪	১.০৫
৩য় সংসদ নির্বাচন ৭ মে, ১৯৮৬	২৮	১৯৮০	৪৭৮৭৬৯৭৯	২৮৮৭৩৫৪০	৬০.৩৭	৫৯.৫৮	০.৭৯
৪র্থ সংসদ নির্বাচন ৩ মার্চ, ১৯৮৮	৮	১১৯২	৪৯৮৬৩৮২৯	২৫৮৩২৮৫৮	৫১.৮১	৫১.৮১	অপ্রকাশিত
৫ম সংসদ নির্বাচন ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১	৭৫	২৭৮৭	৬২১৮১৭৪৩	৩৪৪৭৭৮০৩	৫৫.৪৫	৫৪.৮৫	০.৬০
৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচন ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬	৪৩	১৪৫০	৪৭০০৩৯৫৬	১২৪৭৫৯১৪	২৬.৫৪	২৬.৩২	০.২২
৭ম সংসদ নির্বাচন ১২ জুন, ১৯৯৬	৮১	২৫৭৪	৫৬৭১৬৯৩৫	৪২৮৮০৫৬৪	৭৫.৬১	৭৪.৭৯	০.৮২

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

৫.২.১ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
First Jatiyo Sangsad Election

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। এ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ মোট ১২০৯ জন প্রার্থ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে। মোট ৩ কোটি ৫২ লাখ ভোটারের ৫ হজার ৬৪২ জন মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লাখ ২৯ হাজার ৬৮৩ জন অর্থাৎ ৫৪.৯১% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে ২৮৯টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৮২টি আসনে জয় লাভ করে। ১১টি আসনে আওয়ামী লীগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। এ নির্বাচনে জাসদ ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ একটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫টি আসনে জয় লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সবকটিসহ আওয়ামী লীগ মোট ৩১৫টি আসনের মধ্যে ৩০৮টি আসন পেয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনে গৃহীত বৈধ ও অবৈধ ভোটের পরিমান ছিল ৫৩.৫৫% ও ১.৩৬%। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটের পরিমান ছিল ৭৩.১৯%।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.২ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Second Jatiyo Sangsad Election

১৯৭৯ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বাংলাদেশে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ মোট ২৫৪৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ নির্বাচনে মোট ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৮ জন ভোটারের মধ্যে ১ কোটি ৯৬ লাখ ৭৬ হাজার ১২৪ জন অর্থাৎ ৫১.২৯% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ২৬০টি আসনে জয় লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল ৪১.১৭%। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) লাভ করে ৩৯ টি আসন এবং বালাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান) লাভ করে ২টি আসন। মুসলিম লীগ ও ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ যৌথভাবে লাভ করে ২০টি আসন। মহিলাদের সংরক্ষিত ৩০টি আসন লাভ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। এ নির্বাচনে গৃহীত বৈধ ও অবৈধ ভোটের পরিমান ছিল ৫০.২৪% ও ১.০৫%।

৫.২.৩ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Third Jatiyo Sangsad Election

১৯৮৬ সালের ৭ মে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে মোট ২৮টি দলের প্রার্থীসহ ১৯৮০ জন প্রার্থী ছিল। মোট ৪ কোটি ৭৮ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন ভোটারের মধ্যে ২ কোটি ৮৮ লাখ ৭৩ হাজার ৫৪০ জন অর্থাৎ ৬০.৩৭% ভোটার ভোট প্রদান করেন। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনে বৈধ অবৈধ গৃহীত ভোটের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৫৯.৫৮% ও ০.৭৯%। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসনে জয় লাভ করে। এদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল ৪২.৩৪%। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ লাভ করে ৭৬টি আসন। এদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল ২৬.১৬%। জামাতে ইসলামী লাভ করে ১০ টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী লাভ করে ৩২ টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জাতীয় পার্টি ৩০ টি সংরক্ষিত মহিলা আসনও লাভ করে। ৭ মে-র নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো - অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহন থেকে বিরত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৪ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Fourth Jatiyo Sangsad Election

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মোট ৮টি দলের প্রার্থীসহ মোট ১১৯২ জন প্রার্থী ছিল। মোট ৪ কোটি ৯৮ লাখ ৬৩ হাজার ৮২৯ জন ভোটারের মধ্যে ২ কোটি ৫৮ লাখ ৩২ হাজার ৮৫৮ জন অর্থাৎ ৫১.৮১% ভোটার ভোট দান করেন। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে অবৈধ গৃহীত ভোটের পরিমান বের করা সম্ভব হয় নি। এমনকি নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত এ তথ্য প্রকাশ করতে পারে নি। ১৯৮৮ সনের নির্বাচনে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৫১টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়। এ ছাড়া সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন, জাসদ (সিরাজ) ৩টি আসন, ফ্রিডম পার্টি ২টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৫টি আসন লাভ করে। ৩ মার্চের এ নির্বাচনের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, ৫ দলীয় জোট এবং জামাতে ইসলামী নির্বাচনে অংশগ্রহন করে নি। ১৯৮৮ সালের নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ প্রহসনমূলক নির্বাচন।

৫.২.৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Fifth Jatiyo Sangsad Election

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে। এ নির্বাচনে ৭৫টি দলের প্রার্থীসহ মোট ২৭৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মোট ৬ কোটি ২১ লাখ ৮১ হাজার ৭৪৩ জন ভোটারের মধ্যে ৫৫.৪৫% অর্থাৎ ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৩ জন ভোটার ভোটদান করেন। এ নির্বাচনে বৈধ অবৈধ গৃহীত ভোটের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৫৪.৮৫% এবং ০.৬০%। জাতীয় সংসদে মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে বিএনপি মোট ১৪১টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ লাভ করে ৮৮টি আসন। এ নির্বাচনে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৩০.৮১% এবং ৩০.০৮%। জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩৫টি আসন, যার প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ১১.৯২%। জামাতে ইসলামীর আসন সংখ্যা ছিল ১৮টি এবং প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল ১২.১৩%। ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Sixth Jatiyo Sangsad Election

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল একটি বিতর্কিত নির্বাচন। এ নির্বাচনে ৪১টি দলের প্রার্থীসহ মোট ১৪৫০ জন প্রার্থী ছিল। মোট ৪ কোটি ৭০ লাখ ৩ হাজার ৯৫৬ ভোটারের মধ্যে ২৬.৫৪% অর্থাৎ ১ কোটি ২৪ লাখ ৭৫ হাজার ৯১৪ জন ভোটার ভোট দান করেন। তাতে বৈধ ও অবৈধ গৃহীত ভোটের পরিমান ছিল ২৬.৩২% ও ০.২২%। বিএনপি নেতৃত্বাধীন এ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ অংশগ্রহন করে নি। ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি ২৭৯টি আসন লাভ করে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এতে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ১০টি আসনে জয় লাভ করে। অবশিষ্ট ১০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মতে, এ নির্বাচন ছিল নির্বাচনের নামে এক প্রহসন মাত্র।[৯]

৫.২.৭ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Seventh Jatiyo Sangsad Election

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপির প্রহসনের নির্বাচনের অনতিকাল পরেই ১৯৯৬ সালের ১২ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্ব প্রথম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এক অভূতপূর্ব নির্বাচন। এ নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ মোট ২৫৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মোট ৫ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৩৯৫ ভোটারের মধ্যে ৭৫.৬১% অর্থাৎ ৪ কোটি ২৮ লাখ ৮০ হাজার ৫৬৪ জন ভোটার ভোট দান করেন। উক্ত নির্বাচনে বৈধ ও অবৈধ গৃহীত ভোটের পরিমান ছিল ৭৪.৭৯% ও ০.৮২%। এ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসনে জয় লাভ করে বৃহত্তর দলে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল ৩৭.৪৪%। অন্যদিকে বিএনপি ১১৬টি আসনে জয় লাভ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়, যার প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল ৩৩.৬১%। এছাড়া জাতীয় পার্টি ৩২টি এবং জামাতে ইসলামী ৩টি আসনে জয়ী হয়। উভয়ের প্রাপ্ত ভোটের পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৬.৪০% এবং ৮.৬১%।

---

৯. তালুকদান মনিরুজ্জামান, ভূমিকা অংশ, গণতন্ত্র, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা- মোঃ জাহাঙ্গীর, মে, ১৯৯৫, পৃষ্ঠাঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ বাংলাদেশে দলীয় সরকার ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা (১৯৭৩-৯৬)

A Comparative Study Between The Elections Under Party Govt. and Non-Party Caretaker Govt. (1973-96)

বাংলাদেশে দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তুলনামূলক বিচারে দলীয় সরকারের আমলের নির্বাচনের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচন অনেকগুণ নিরপেক্ষ। বিগত ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনসমূহ তুলনা করলে দেখা যায়, ৭টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ২টি সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ৫টি সংসদ নির্বাচন হয়েছিল দলীয় সরকারের অধীনে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনেই মানুষ নিরপেক্ষভাবে রায় দিয়েছে। নিচে দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো ঃ

১. দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে একদিকে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি যেমন কম থাকে, অন্যদিকে অংশগ্রহনকারী প্রার্থীর সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একদিকে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিও সর্বাধিক থাকে।

২. দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অনেক প্রার্থী বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিনা- প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

৩. দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে দলীয় প্রভাবই ব্যাপক লক্ষণীয়, কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তা সম্ভবপর নয়।

৪. দলীয় সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৫. রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার কিংবা পোলিং অফিসার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে। কিন্তু দলীয় সরকারের সময় তারা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ায় স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন।

৬. দলীয় সরকারের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনগুলোতে জনগণের মধ্যে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়।

৭. দলীয় সরকারের সময় সরকারি প্রচার মাধ্যম দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সরকারি প্রচার মাধ্যমসমূহ অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে।

৮. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনায় দলীয় সরকারের অধীনে জাল ভোট প্রদানের হার তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে।

৯. দলীয় সরকারের চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার বেশি থাকে।

১০. দলীয় সরকারের চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে মহিলাদের ভোট প্রদানে উৎসাহ বেশি থাকে।

১১. দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অপেক্ষা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকেই সাধারণ মানুষ অধিক গ্রহনযোগ্য বলে মনে করে।

১২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দলীয় সরকারের তুলনায় ভাল থাকে। কেননা এ সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দলীয় প্রভাববিহীন নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

১৩. দলীয় সরকার নির্বাচনে জয়রাভের জন্য সরকারি অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করে নির্দ্বিধায়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এগুলোকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

১৪. দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অপেক্ষা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত নির্বাচন সম্ভব।

১৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচনে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য অধিক কেন্দ্র স্থাপন চোখে পড়ে, যা সার্বিক তুলনায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনকে অধিক স্বচ্ছ বলে প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.২
দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন (১৯৭৩-১৯৯৬)

সন	১৯৭৩	১৯৭৯	১৯৮৬	১৯৮৮	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯৬
সংসদ	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৫ম সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৭ম সংসদ
সরকার পদ্ধতি	সংসদীয়	প্রেসিডেন্সিয়াল	প্রেসিডেন্সিয়াল	প্রেসিডেন্সিয়াল	প্রেসিডেন্সিয়াল	সংসদীয়	সংসদীয়
ক্ষমতাসীন দল	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জাতীয় পার্টি	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	বিএনপি	তত্ত্বাবধায়ক সরকার
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোঃ ইদ্রিস	বিচারপতি	বিচারপতি	বিচারপতি	বিচারপতি	বিচারপতি	জনাব আবু হেনা
নির্বাচনের তারিখ	৭ মার্চ, ৭৩	১৮ ফেব্রুঃ ৭৯	৭ মে, ৮৬	৩ মার্চ, ৮৮	২৭ ফেব্রুঃ ৯১	১৫ ফেব্রুঃ ৯৬	১২ জুন, ৯৬
কত আসনে প্রতিযোগিতা হয়েছে	২৮৯	৩০০	৩০০	২৮১	৩০০	২৫২	৩০০
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	১১	-	-	১৯	-	৪৮	-
নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী দল ও জোট	১৪	২৯	২৮	৮	৭৫	৪৩	৮১
স্বতন্ত্রসহ মোট প্রার্থী	১০৯১	২১২৫	১৫২৭	৯৭৮	২৭২৮	১৪৫০	২৫৭৪
মোট ভোটার	৩৫২০৫৬৪২	৩৮৩৬৩৮৬৮	৪৭৯১২৪৪৩	৪৯৮৬৩৮২৯	৬২১৮১৭৪৩	৫৬১৬৩২৯৬	৫৬৮৮৭৫৮৮
প্রাপ্ত ভোট	১৯৩২৯৬৮৩	১৯৬৭৬১২৪	২৮৫২৬৬৫০	২৮৮৭৩৫৪০	৩৪৪৭৭৮০৩	পাওয়া যায়নি	৪২৫৫২১৪৯
দলীয় আসন সংখ্যা	আঃ লীগ-২৯৩, অন্যান্য-৭	বিএনপি-২০৭, আঃ (মালেক)-৩৯ অন্যান্য-৫৪	জাতীয় পার্টি ১৫৩, আঃ লীগ-৭৬, অন্যান্য-৭১	জাতীয় পার্টি ২৫১, অন্যান্য-৪৯	বিএনপি ১৪০, আঃ লীগ-৮৮, অন্যান্য-৭২	বিএনপি-২৭৮, অন্যান্য-৭২	আঃ লীগ-১৮৬, বিএনপি-১১৬, অন্যান্য-৩৮
নির্বাচন কেন্দ্র	১৫০৮৪	২১৯০৫	২৩২৭৯	২২৩৯৩	২৪১৫৪	২১১০৬	২৫৯৫০৭

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

৫.৩.১ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সাংসদ
Elected MP Without Competition

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনসমূহ তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাসে কেবলমাত্র দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় নির্বাচনসমূহেই কোন আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবার ঘটনা ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নি। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কেউই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারে নি। অর্থাৎ এ সময়ের প্রতিটি আসনেই অসংখ্য প্রার্থী নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছে এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে। বিগত ৭টি সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৭৮ জন সাংসদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়, যার সবগুলোই হয় দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সকল সদস্যই দলীয় সদস্য। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ভাচিত সাংসদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময় প্রার্থী দলীয় প্রভাবও ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহী বা সম্ভাব্য প্রার্থীরেদর জোর করে, কৌশলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। সর্বাধিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে ৬ষ্ঠ সংসদে ৪৮ জন অপর দিকে ১ম সংসদে ১১ জন এবং ৪র্থ সয়সদে ১৯ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

448916

৫.৩.২ আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা

Number of Candidates on Per Seat

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা বেশী থাকে এবং দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম থাকে । তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রার্থীদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এবং ভয়ভীতি কম থাকার কারণে এ সময়ে অধিক লোক নির্বাচনে অংশ নেয়। সার্বিক দৃষ্টিতে বিগত অনুষ্ঠিত হওয়া ৭টি সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনায় দেখা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা ছিল গড়ে ৫ জন করে, অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ জনে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনের প্রতি অধিক আস্থা জন্ম নিয়েছে। নিচে সারণী-৫.৩ এ তা দেখানো হলো ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.৩

আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন						তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন	
সংসদ	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ
সন	১৯৭৩	১৯৭৯	১৯৮৬	১৯৮৮	১৯৯৬	১৯৯১	১৯৯৬
মোট প্রার্থী	১০৯১	২১২৫	১৫২৭	৯৭৮	১৪৫০	২৭৮৭	২৫৭৪
আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা	৪	৭	৫	৩	৫	৯	৯
গড়ে			৫			৯	

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

৫.৩.৩ নির্বাচন বর্জন

Leaving Out Election

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনসমূহে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন বর্জনের ইতিহাস তুলনা করলে দেখা যায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচন থেকে সরে এসে সেই নির্বাচন বর্জন করেছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোন দলই নির্বাচন বর্জন করে নি, বরং দলগুলো পূর্ণ শক্তি নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। উদাহরনস্বরূপঃ ৪র্থ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি, ৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচন আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রধান দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করেছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহনকারী সরকারের অধীনে পরবর্তী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উপ-নির্বাচনসমূহ বিরোধী দল বর্জন করেছে। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমুহের প্রতি বিরোধী দলের কোন আস্থা থাকে না। দলীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে জগণের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজ দলীয় প্রার্থীকে জিতিয়ে নেয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ রকম কোন ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৪ ভোটকেন্দ্র সংখ্যা

Number of Election Center

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনসমূহের ভোট কেন্দ্রের সংখ্যার হিসাব করলে দেখা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচসমূহের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বেশী থাকে। নিম্নে সারণী-৫.৪ এ দেখা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে ভোট কেন্দ্র সংখ্যা শুধুই বেড়েছে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে এ সংখ্যা কমেছে বা বেড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ১ম সংসদের তুলনায় দ্বিতীয় সংসদে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে ৬৮২১টি, দ্বিতীয় সংসদ থেকে তৃতীয় সংসদে বেড়েছে ১৩৭৪টি। কিন্তু ৪র্থ সংসদে এ সংখ্যা কমেছে ৮৮৬টি। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫ম সংসদ নির্বাচনে আবার ভোটকেন্দ্র বেড়েছে ১৭৫১টি। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে ভোটকেন্দ্র কমেছে ৩০৪০টি। আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৭ম সংসদে বেড়েছে ৪৫৮১টি। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র সংখ্যা দু'বার কমেছে এবং বেড়েছে খুবই কম। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রতিবারই এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যৌক্তিকভাবে। তাই একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানুষকে ভোটমুখী করতে ভোটকেন্দ্র বাড়িয়েছে। আর দলীয় সরকার নির্বাচনী ফলাফল নিজের অনুকুলে রাখতে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়েছে।

সারণী - ৫.৪

আসন প্রতি ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা

দলীয় সরকারের সময়						তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়	
সংসদ নির্বাচন	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ
ভোটকেন্দ্র	১৫০৮৪	২১৯০৫	২৩২৭৯	২২৩৯৩	২১১০৬	২৪১৫৪	২৫৯৫৭
আসন প্রতি ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	৫০	৭৩	৭৮	৭৫	৭১	৮১	৮৭
গড়ে	৬৯					৮৪	

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৫ নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক দল ও জোট

Participant Political Parties & Alliances in Election

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দল ও জোটের সংখ্যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম ছিল। দলীয় সরকারের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে তিন গুণেরও বেশী সংখ্যক রাজনৈতিক দল ও জোট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নিম্নোক্ত সারণী-৫.৫ এ দেখা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে কম সংখ্যক জোট ও দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অর্থাৎ মাত্র ৮টি রাজনৈতিক দল ও জোট নির্বাচনে অংশগ্রহন করে । অপরদিকে, সর্বোচ্চ সংখ্যক রাজনৈতিক দল ও জোট অংশ নেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। অর্থাৎ ৮১টি রাজনৈতিক দল ও জোট নির্বাচনে অংশগ্রহন করে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহনের মাত্রা দলীয় সরকারের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনে বেশী। তাই বলা যায় নির্বাচন যতটা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে, নির্বাচনে ততই অংশগ্রহনের হার বেড়েছে।

সারণী-৫.৫

নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক দল ও জোট সংখ্যা

	দলীয় সরকারের অধীনে					তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে	
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ
দল ও জোট সংখ্যা	১৪	২৯	২৮	৮	৪৩	৭৫	৮১
গড়ে	২৪টি					৭৩টি	

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৬ নির্বাচনে মোট ভোটার ও প্রদত্ত ভোটের হার

Total Voter & Rate of Poled Vote in Election

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতি নির্বাচনেই ভোট প্রদানের হারে তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এ হার সর্বাধিক। বিগত ৭টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ২য় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার (৫১.২৯%) ছিল সর্বনিম্ন। আর ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার (৭৪.৮%) ছিল সর্বাধিক । তাই দেখা যাচ্ছে যে, দলীয় সরকারের অধীনে মানুষের ভোট প্রদানের হার নির্দিষ্ট ধারায় বৃদ্ধি পায় নাই, সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রেই এ হার ৬০% এর নীচে। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পর্যায়ক্রমে ভোট প্রদানের হার উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ।

সারণী-৫.৬
নির্বাচনে মোট ভোটার ও প্রদত্ত ভোটের হার

দলীয় সরকারের অধীনে						তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে	
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ
মোট ভোটার	৩৫২০৫৬৪২	৩৮৭৮৯২৩৯	৪৭৮৭৬৯৭৯	৪৯৮৬৩৮২৯	৫৬১৪৯১৮২	৬২১৮১৭৪৩	৫৬৮৮৭৫৮৮
প্রদত্ত ভোটের হার	৫৪.৯১%	৫১.২৯%	৫৯.৫৪%	৫৭.৯০%	পাওয়া যায় নি	৫৫.৪৫%	৭৪.৮%
সার্বিক হার	৫৫.৯১%					৬৮.৬১%	

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে। আর এ কারণেই ক্ষমতার পরিবর্তন হয়ে নতুন দল ক্ষমতায় এসেছে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকারী দল নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিরোধী দলে স্থান

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহে ক্ষমতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ যে দলের অধীনে নির্বাচন হয়েছে, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। বিরোধী দল বিরোধী দলেই থেকে গেছে।

তাই ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দলীয় সরকারের শাসনামলে ১ম সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৯৩টি আসন লাভ করে, ২য় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯ সনে বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি ২০৭টি আসন লাভ করে। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির অধীনে অনুষ্ঠিত ৩য় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসন, ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির অধীনে ৪র্থ সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন লাভ করে। এ ছাড়া বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনেও ক্ষমতাসীন দল বিএনপি অধিকাংশ আসন লাভ করে। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এর ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এ দু'টি নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক

Thirteenth Amendment of the Constitution and the Caretaker Government Controversy

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ। জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, অস্থায়ী সরকার অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'সমঝোতামূলক আয়োজন' গণতন্ত্রচর্চাকারী বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে দেখা গেছে।[১] কিন্তু জাতীয় নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক আয়োজন বাংলাদেশই প্রথম করেছে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে ১৯৯৬ সালের মার্চে দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য-সহায়তা প্রদান ও সংবিধানের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে 'ত্রয়োদশ সংশোধনী' বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। পরে সংসদ কর্তৃক বিলটি পাশ হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক ভিত্তি লাভ করে।

৬.১. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার

Thirteenth Amendment of the Constitution or the Caretaker Government

বাংলাদেশে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তা এ যাবৎ বিশ্বের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার যাবতীয় উন্নয়নের (নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রশ্নে) মিলিত রূপ। সেদিক থেকে বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ও সংযোজন হিসেবে মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে।[২]

---

১. তারেক এম. টি. রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৪১।

২. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ সংশোধনীর যে পূর্ণ পাঠ আমরা বাংলাদেশ গেজেটের ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ একটি অতিরিক্ত সংখ্যার মাধ্যমে পেয়েছি, তা পাঠ করে মনে হয় এখানে সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ব্যত্যয় নির্দিষ্টভাবে ঘটানো হয়েছে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৫৫ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।" সংবিধানের ৫৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – "মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।" আর বহুল আলোচিত ৫৬ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – "যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।"[৩]

ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে '৫৮-ক' সংখ্যক একটি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করা হয়। বিদ্যমান ৫৮ অনুচ্ছেদের পর '২ক পরিচ্ছেদ' শীর্ষক ৪টি অনুচ্ছেদ (৫৮-খ, ৫৮-গ, ৫৮-ঘ, ও ৫৮-ঙ) সংবলিত একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পর ৫টি অনুচ্ছেদের (৬১, ৯৯, ১২৩, ১৪৭, ১৫২ অনুচ্ছেদ) কিছু প্রাসঙ্গিক সংশোধন করা হয় এবং সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে 'ফরম ১ক' ও 'ফরম ২ক' শপথ (বা ঘোষণা) সন্নিবেশিত করা হয়।[৪]

ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮-গ (১১) অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ও পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন একজন প্রধান উপদেষ্টার বিধান করা হয়েছে। ৫৮-খ (৩) অনুচ্ছেদে 'সংশ্লিষ্ট মেয়াদে' উক্ত প্রধান উপদেষ্টার দ্বারা বা তার কর্তৃত্বে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবার কথা বলা হয়েছে এবং ৫৮-খ (২) অনুচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকার বিধান করা হয়েছে।[৫]

৬.১.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক রূপ
Constitutional Structure of Caretaker Government

বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা বিধিবদ্ধ হয়। বাংলাদেশ সংবিধানে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনে সংবিধানের ৬১, ৯৯, ১২৩, ১৪৭, ১৫২ অনুচ্ছেদে এবং

৩. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৪৮।
৪. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৪৮।
৫. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় তফসিল সংশোধন করে চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামে একটি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ হয় এবং সংবিধানের ৫৮ - (ক) (খ) (গ) (গ) (ঙ) নামে নতুন ৫টি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়।

নিচে নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের সাংবিধানিক রূপ বা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

৫৮-খ। নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার ঃ সংবিধানের ৫৮-খ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে –

১। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বা সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহন করেন সে তারিখ হতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যভার গ্রহনের তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার থাকবে।

২। নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

৩। (১) দফায় উল্লিখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা বা তাঁর কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী কাজ পরিচালিত হবে।

৪। সংবিধানের ৫৫ (৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলি অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল নির্বাহী কাজ রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে; সকল আদেশ ও চুক্তিপত্র রাষ্ট্রপতি বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং এসব ক্ষেত্রে আদালতে কোন প্রশ্ন উথাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধি প্রণয়ন করবেন।

৫৮-গ। নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের গঠন ও উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ঃ সংবিধানের ৫৮-গ অনুচ্ছেদ অনুসারে –

১। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির দ্বারা তাঁরা নিযুক্ত হবেন।

২। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার বা ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনর দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হবেন। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ারযোগ্য প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তবে তিনি রাজি না হলে বা পাওয়া না গেলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

৪। যদি কোন প্রধান বিচারপতি রাজি না হন বা পাওয়া না যায় তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য সর্বশেষ বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।। যদি তিনি রাজি না হন তাহলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

৫। যদি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারককে পাওয়া না যায় তবে রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমুহের সাথে আলোচনাক্রমে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য এরূপ বাংলাদেশী কোন নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

৬। যদি (৩), (৪) ও (৫) দফায় বর্ণিত বিধান কার্যকরী করা না হয় তবে রাষ্ট্রপতি নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহন করবেন।

৭। কোন ব্যক্তি উপদেষ্টা হতে হলে নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে ঃ

(ক) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে ;

(খ) কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের সাথে অঙ্গীভূত কোন সংগঠনের সদস্য হওয়া চলবে না ;

(গ) সংসদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নন বা হবেন না - এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দিতে হবে এবং

(ঘ) বাহাত্তর বছরের অধিক বয়স্ক হওয়া চলবে না।

৮। রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণকে নিয়োগ করবেন।

৯। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

১০। তাছাড়া নিয়োগের যোগ্যতা হারালে কেউ স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

১১। প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য সুয়োগ সুবিধা লাভ করবেন। উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।

১২। নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে কার্যভার গ্রহন করবেন সে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

৫৮-ঘ। নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের কার্যাবলী ঃ ৫৮-ঘ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী –

১। নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করবেন এবং প্রয়োজন ব্যতীত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন না।

২। নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন।

৫৮-ঙ। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকরতা ঃ সংবিধানের ৫৮-ঙ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সংবিধান সংশোধনের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁর প্রতি স্বাক্ষর গ্রহনপূর্বক কার্য করার বিধানসমুহ অকার্যকর হবে।

৬.১.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ক্ষমতা
Constitutional Power of Caretaker Government

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করা হয়েছে, তার সাংবিধানিক ক্ষমতা কতটুকু - এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ঃ** সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ৬১ অনুচ্ছেদের সংশোধন করে বিধান করা হয়েছে , "সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদে 'নিয়ন্ত্রিত হবে' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যে মেয়াদে ৫৮-খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে সে মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।" এ সংশোধনীর দ্বারা কার্যত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী করা হয়েছে। সংশোধনীর আগে এতে বলা হয়েছিল - বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয়ের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে। আইন প্রণয়নের অধিকারী হবে সংসদ। তাছাড়া স্বাভাবিক সময়ে ৪৮ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতিকে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া সব কিছুই করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। তাই রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক সর্বাধিনায়ক হলেও, সংসদ নেতা ও সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই অন্য সব ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে । কিন্তু ত্রয়োদশ সংশোধনীতে এ অনুচ্ছেদের শেষে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস সেনাপ্রধানকে অপসারণ করে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ দিলে বিতর্কিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

২। **জরুরী অবস্থা ঘোষণার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধানাবলি প্রয়োগের কর্তৃত্ব থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে। সংবিধানের ১৪১-ক (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন হুমকির সন্মুখীন, তাহলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। ১৪১-গ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার সময়ে মৌলিক অধিকার আদায়ে মামলা করা বা বিচারাধীন এ ধরনের মামলা স্থগিত করতে পারবেন। সংসদীয় সরকারের সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর এবং মামলা স্থগিতের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অপরিহার্য। ৫৮-ঙ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ৪৮ (৩), ১৪১-ক (১) ও ১৪১-গ (১) অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তার প্রতিস্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতির কার্য করার বিধান অকার্যকর হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টার আনুষ্ঠানিক পরামর্শ ছাড়াই এ নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। **প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত সব বিধান অকার্যকর ঃ** সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮-ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির নামে সব কিছু সম্পাদিত হওয়ার বিধান সংবলিত ৫৫ (৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদ ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত বিধানাবলি সংবলিত সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকবে। উল্লেখ্য, সংবিধানের ৫৫ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাহী সরকারের সর্বোচ্চ ফোরাম মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকে। এটাই সংসদীয় পদ্ধতির মূল সুর। শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে।

৪। **নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতে ঃ** সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদের মতোই ৫৮-খ (৩) অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক ও তার কর্তৃত্বে প্রয়োগ হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শে নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করতে হবে। তাই সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ উল্লেখ করেছেন, নির্বাহী ক্ষমতার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।[৬]

৬.২ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ঃ একটি বিতর্কিত পর্যালোচনা

Thirteenth Amendment of the Constitution : A Controversial Discussion

যে কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে এর দোষ-ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে এবং ধীরে ধীরে ত্রুটিগুলো শুধরিয়ে সে ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। ব্যবস্থাটি কাগজে কলমে যতই ভাল হোক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি উত্তম হলেও, বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে এ ধারণাটি নিয়ে রয়েছে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক। তত্ত্বগতভাবে এ সরকারের ধারণাটি একেবারে নবতর পর্যায়ের মধ্যেই রয়ে গেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কিছু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকলেও, এ দায়িত্ব পালন কতটুকু স্বচ্ছ ও প্রভাবমুক্ত ছিল, নির্বাচনে

---

৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ত্রয়োদশ সংশোধনী, (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)।

Dhaka University Institutional Repository

পরাজয়বরণকারী দলের মন্তব্য এবং বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক কিছু সংস্কারমুখী মনোভাব এ ব্যবস্থাকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলেছে। রাজনৈতিক সহিংসতা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম অসহিষ্ণু মনোভাব এবং সর্বোপরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কিছু কিছু পদক্ষেপ ও ভূমিকা বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালের ড. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহ্মদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও কার্যক্রম পুরো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আরও বিতর্কিত করে তুলে। এ ছাড়া বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-০৮) সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বাইরে গিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলেছে। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথমত ঃ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮-খ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "The Non Party Caretaker Government shall be collectively responsible to the President." অর্থাৎ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জবাবদিহিতা থাকবে রাষ্ট্রপতির কাছে। আইন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এ বিধানের ফলে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি রাষ্ট্রপতির পক্ষপাতিত্ব থাকলে, তিনি ঐ দলের পক্ষে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন। অন্যদিকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রাষ্ট্রপতির কাছে আইনগতভাবে জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকলে, সমগ্র দেশ ও জাতি যে কোন অশুভ চক্রান্তের শিকার হতে পারে । তাই শেষ পর্যন্ত একটি অপোষরফা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের কার্যাবলীর জন্যে যৌথভাবে দায়ী থাকবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টাদেরকে অপসারণ করতে পারবেন না। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে এটি কোন ভাল সমাধান নয়। কারণ এখানে জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই।

দ্বিতীয়ত ঃ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮-গ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের নিয়োগ দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা একেবারেই গৌণ বা অনুপস্থিত। আইনজ্ঞদের মতে, অন্য কারো

Dhaka University Institutional Repository

মতামতের তোয়াক্কা না করে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে এককভাবে রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকায়, প্রধান উপদেষ্টা পদে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা বিশেষ পছন্দের ব্যক্তি নিয়োগ পেলেও কারো কিছু বলার থাকবে না।

তৃতীয়ত ঃ ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮-গ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগ দান করেবেন। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের আশংকা হচ্ছে যে, প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শের বিষয়টির সাথে লিখিত পরামর্শের কোন শর্ত যুক্ত না থাকায়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি আদৌ কোন পরামর্শ নিয়েছেন কি-না, বা পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন কি-না তা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ফলে রাষ্ট্রপতি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১০ জন উপদেষ্টার সকলকেই বা অধিকাংশকেই নিয়োগ করলে অন্য কারো কিছু বলার নেই।

চতুর্থত ঃ ত্রয়োদশ সংশোধন আইনের অসঙ্গতিগুলোর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে সাবেক এটর্নি জেনারেল ব্যারিষ্টার রফিকুল হক বলেন, এত আন্দোলন, এত রক্ত ঝরার পরেও দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্থাপিত বিল ক্ষমতাসীন দলের আন্তরিকতার অভাবকেই প্রকটভাবে তুলে ধরেছে। তিনি বিলের ৫৮-গ (১), ৫৮-গ (৬), ৫৮-গ (৮) অনুচ্ছেদগুলো ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির পদের আবরণে এক ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে এভাবে তৈরী নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে কার্যতঃ রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ সরকার মাত্র। তাই ঐ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির আশা-আকাঙ্খারই প্রতিফলন ঘটবে, জনগণের নয়।

পঞ্চমত ঃ ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সর্বোচ্চ ফায়দা লুটতে চেয়েছে। তাই গণভোটের ব্যাপারটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই টেনে আনা হয়েছে। আবার রাজনৈতিক কারণেই গণভোটকে পরিহার করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে জনমত যাচাইয়ের কোন সদিচ্ছা বা পরিকল্পনা কোন রাজনৈতিক দলেরই ছিল না।[৭] অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়টি সংবিধানে সংযোজনের জন্য গণভোটের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয় নি।

---

৭. মোঃ মাইনুল আহসান খান, সাংবিধানিক আইন, রাজনীতি, ধর্ম ও স্বাধীনতা, ঢাকা, বিশ্ব সহিত্য ভবন, ৫০, জুলাই, ১৯৯৮, পৃষ্ঠাঃ ১৫৪-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠত ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী তথা সরকার প্রধানকে অবশ্যই পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য হতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার প্রধান হিসেবে অনির্বাচিত প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন নিয়ে রয়ে গেছে প্রশ্ন বিতর্ক। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সংবিধানের মৌল নীতিবিরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের দুটি অনুচ্ছেদেরও পরিপন্থী।[৮]

সপ্তমত ঃ ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকাল ৯০ দিনের বেশী নয়। কিন্তু এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কারণে সংসদ নির্বাচন করা না গেলে বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা সম্ভব না হলে, দেশ ও সরকারের কি হবে তাও সংবিধানে উল্লেখ নাই। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, "The Non Party Caretaker Government shall stand dissolved on the date on which the Prime Minister enters upon his office after the constitution of new Parliament."[৯] সুতরাং এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে।

অষ্টমত ঃ সংবিধানের ৫৮-ঘ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা দৈনন্দিক কার্যবলী পরিচালনা করবেন। কিন্তু এ দৈনন্দিন কাজ বলতে আসলেই কি বোঝায় তা সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয় নি। তবে প্রধান উপদেষ্টাকে অক্ষমতা বা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রপতি তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন না।

নবমত ঃ বহু বিষয়ের মত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতার বাইরে রাখা হয়। রাষ্ট্রপতিই এ ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। বাস্তবে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের বহু অনুচ্ছেদকেই অকার্যকর করে দেয়। প্রতিরক্ষা বিষয়ক অনুচ্ছেদ ৬২ ও ৬৩ সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়ে। মোঃ মাইনুল আহসান খান লিখেছেন, "দেশের প্রতিরক্ষাসহ বহু বিষয় আজ অনিশ্চতার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে। এ অনিশ্চয়তা দূরীকরণের ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই। সাংবিধানিকভাবেই প্রধান উপদেষ্টার হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার সামান্যতম সুযোগও নেই।"[১০]

---

৮. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ জুলাই ২০০৩।

৯. The Constitution of Bangladesh, The Thirteenth Amendment, 58-C (12).

১০. মোঃ মাইনুল আহসান খান, সাংবিধানিক আইন, রাজনীতি, ধর্ম ও স্বাধীনতা, ঢাকা, বিশ্ব সহিত্য ভবন, ৫০, জুলাই,১৯৯৮ পৃষ্ঠাঃ ১৫৪-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

দশমত ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে সংসদের অনুমতি ব্যতিত রাষ্ট্রপতি কোন রাষ্ট্র বা শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, বিদেশী শত্রুবাহিনীও যদি এ সময় সমগ্র দেশটি দখল করে নেয় তবুও রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ করার আদেশ দিতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী নিজ পদে বহাল থাকলে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেই বিধান সংবিধানে রয়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ কাজটি রাষ্ট্রপতি কিভাবে করবেন তা কারও জানা নেই।

একাদশত ঃ বাংলাদেশে যে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সে ধারণার পরিপন্থী। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর বেশীরভাগ রাজনৈতিক দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি বিশেষ একটি দলকে সহযোগিতা করার অভিযোগ আনে। অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে অভিযোগ মেনে নেয় নি। তা প্রমাণের সুযোগও কাউকে দেয়া হয় নি। তাই অভিযোগগুলো লিপিবদ্ধ আকারে রয়ে গেছে। কোন কোন সময় নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান দলীয় সরকারের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর।[১১]

দ্বাদশত ঃ সংবিধানে দলীয় সরকারের বিতর্কিত ভূমিকার জবাব মাধ্যমে দেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকা ভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার বিধান সংবিধানে রাখা হয় নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা সম্পর্কে অভিযোগ তোলার বিধানও রাখা হয় নি। অথচ জবাবদিহিতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ।[১২]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ক্ষমতা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে এক জটিল ও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। তিনি ১৯৯৬ সালের ১৩ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন,

---

১১. মাহমুদ শফিক, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অন্যন্যা প্রকাশনা, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৯৬, পৃষ্ঠাঃ ১৫৪।

১২. মাহমুদ শফিক, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অন্যন্যা প্রকাশনা, ঢাকা, নভেম্বর-১৯৯৬, পৃষ্ঠাঃ ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

"বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অত্যন্ত সীমিতকালের মধ্যে কতকগুলো সীমিত উদ্দেশ্য পালনের জন্যে গঠিত। দেশের বিরাজমান বিভিন্নমুখী সমস্যা পুরোপুরি সমাধান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয় এবং তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার যথাসময়ে দেশের বিরাজমান সমস্যা উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করবেন। আপনাদের সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এমন কোন বিতর্ক উত্থাপন করবেন না, যা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।"[১৩]

নেপালের সাবেক প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর উপর কিছু মন্তব্য করেন। তার মন্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

"সংশোধনীতে অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকুতে রাষ্ট্রপতি আর প্রধান উপদেষ্টাকে একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ সীমিত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার উপদেশ মোতাবেক চলতে বাধ্য থাকবেন না। সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যে ৫৮খ(২) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়েছে তাতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রাষ্ট্রপতির প্রতি দায়বদ্ধ থাকার কথা বলা হলেও কিভাবে এ বিধান কার্যকর হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। এই অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রয়োজন ছাড়া নীতিনির্ধারণী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু 'নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত' এবং 'প্রয়োজন' দুটি কথার একেকজন একেক অর্থ করতে পারেন এবং এর ফলে ভবিষ্যত কর্মকান্ডে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ...। ৫৮(খ) (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এই সংশোধনীতে প্রতিরক্ষা বিভাগ হতে সম্পর্কিত আইনগুলোর প্রয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত আইনগুলোর প্রয়োগ অবশ্যই নির্বাহী ক্ষেত্রের বিষয় বিধায় এই সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক বিষয়ে একপ্রকার অনভিপ্রেত দ্বিরাভাস সৃষ্টি করা হয়েছে। ...উপদেষ্টা এবং রাষ্ট্রপতি উভয়ে যুগপৎ তাদের ব্যাখ্যা- অনুযায়ী তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলে সরকার পরিচালনায় রীতিমতো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

---

১৩. দৈনিক সংবাদ, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এইসব দ্বিরাভাস এবং দ্বিরাভাষিক কাঠামোর ভেতরেই কাজ করতে হয়েছে, তবু তারা তাদের সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। তারা সময়ের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তবু এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে এটিকে কি একটি মডেল হিসেবে নেওয়া যায়?

প্রতিবার সংসদ ভেঙে দেয়ার পর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের খাতিরে স্বল্পকালীন হলেও একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি অযৌক্তিক ছেদ। যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থিতিশীল না হয়, যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই গণতন্ত্রকে বাঁচাতে পারবে না।"[১৪]

সবশেষে বলা যায়, স্বাধীনতার ছত্রিশ বছরে আমরা সংসদীয় রাজনীতিকে মনে প্রাণে গ্রহন করে নিয়েছি এবং সংসদীয় রাজনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সংবিধান সংশোধন করে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা করেছি। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। কিন্তু এ ব্যবস্থায় দুই দুটি নির্বাচন সম্পন্ন হলেও তা এখন একটি বড় ধরনের বিতর্কের মুখে পড়েছে। দাবি করা হচ্ছে এ ব্যবস্থার সংস্কার আনতে হবে।[১৫]

৬.২.১ ত্রয়োদশ সংশোধনী এবং শব্দ ও বাক্য বিভ্রাট

The Thirteenth Amendment and Word and Sentence Error

অধ্যাপক তারেক এম টি রহমান সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর কিছু শব্দ ও বাক্যবিভ্রাট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৬] নিচে এগুলো করা হলো ঃ

প্রথমত ঃ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮-ক সংখ্যক 'অনুচ্ছেদ'কে দু'বার 'অনুচ্ছেদ' বলা হয়েছে এবং তিনবার 'পরিচ্ছেদ' বলা হয়েছে। অধ্যাপক তারেক এম টি রহমান মনে করেন, এখানে কোনটি সঠিক 'অনুচ্ছেদ' না 'পরিচ্ছেদ' - তা সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সম্ভবত এখানে 'পরিচ্ছেদ'-এর ব্যবহার ভুল হয়েছে।

---

১৪. Governance and Electoral Process in Bangladesh, Parliamentary Election 1996, Report of SAARC-NGO Observers, PP. 25-28.

১৫. তারেক শামসুর রেহমান, গণতন্ত্র সুশাসন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ভূমিকা অংশ, দিপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ৭।

১৬. তারেক এম. টি. রেহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ঃ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পরে একটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করতে চেয়েছে ত্রয়োদশ সংশোধনী। সেই পরিচ্ছেদকে উল্লেখ করা হয়েছে '২ক পরিচ্ছেদ' হিসেবে। তারেক এম টি রহমানের মতে, '২ক পরিচ্ছেদ' -এর পর '২য়-ক পরিচ্ছেদ' হওয়াই ছিল বেশী সঙ্গত। যেমনঃ সংবিধানের 'নবম ভাগ'-এর পর যুক্ত হয়েছে 'নবম ক ভাগ'।

তৃতীয়ত ঃ সংবিধানের ৫৮-খ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হচ্ছে- (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা ৫৮-ঘ (১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎকর্তৃক তা প্রযুক্ত হবে। এখানে একবার বলা হল - 'প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক তার কর্তৃত্বে .... নির্বাহী ক্ষমতা ... প্রযুক্ত হবে', আবার বলা হচ্ছে - 'এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎকর্তৃক তা প্রযুক্ত হবে'। তারেক এম টি রহমান বলেন, –এ বিধানটি অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

চতুর্থত ঃ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ায় প্রধান উপদেষ্টা দ্বারা বা তার কর্তৃত্বেই রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হতে পারত। কিন্তু এর পরে 'এবং' দ্বারা আরেকটি 'কথা' যুক্ত করে দেয়ায় নানামুখী অর্থ ও ভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

পঞ্চমত ঃ 'নির্দলীয়' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ বলতে 'অনধিক দশজন উপদেষ্টার' পরামর্শকে বোঝানো হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দরকার - এ উপদেষ্টাদের 'আনুষ্ঠানিক' অথবা 'অনানুষ্ঠানিক' পরামর্শের ভিত্তিতে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন কি-না।

ষষ্ঠত ঃ প্রশ্ন আরও আছে- উপদেষ্টাদের এ 'পরামর্শ' বাধ্যতামূলক না স্বোচ্ছামূলক? প্রধান উপদেষ্টার একক কর্তৃত্বে এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শসমেত কর্তৃত্বে – উভয় প্রকারেই প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে অথবা হতে পারবে কি-না, এ প্রশ্নেরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মোট কথা, 'এবং'-এর মাধ্যমে যুক্ত বাক্যটি গুরুত্বপূর্ণ এ পুরো বিধানটিকে অস্পষ্ট ও জটিল করে তুলেছে। এক্ষেত্রে তারেক এম টি রহমানের দুটি পরামর্শ হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রকৃতপক্ষেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টা চাইলে সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদের [৫৮-ঘ (১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সাপেক্ষে] মতো স্পষ্ট আইন করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ৫৮-খ (৩) অনুচ্ছেদে 'এবং' দ্বারা যুক্ত কথাটি বাদ দেয়া যেতে পারে।

২। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'অনধিক দশজন উপদেষ্টার' পরামর্শকে প্রধান উপদেষ্টার জন্য বাধ্যতামূলক করতে চাইলে (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে 'শব্দগুলোর পরে' নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ 'অনুযায়ী' বা 'মোতাবেক' কথাটি যুক্ত করা যেতে পারে। এ উভয় ক্ষেত্রেই আইনটি স্পষ্ট থাকবে।

সপ্তমত ঃ সংবিধানের ৫৮-গ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে - 'প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে...।'। এখানে বিভ্রাট ঘটছে 'প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা' কথাটি নিয়ে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫ (১) অনুচ্ছেদে আছে - 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে...।'। এখানে কথাটি স্পষ্ট। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে আবার 'প্রধান উপদেষ্টা' থাকতে যাবেন কেন? লেখক তারেক এম টি রহমান মনে করেন, ৫৮-গ (১) অনুচ্ছেদে লিখিত 'প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর' কথাটি বাদ দিতে হবে।

অষ্টমত ঃ সংবিধানের ৫৮-গ (৪) অনুচ্ছেদে 'যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় ...' এবং ৫৮-গ (৫) অনুচ্ছেদে 'যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায়...' লেখা হয়েছে। অথচ তারেক এম টি রহমান মনে করেন, প্রথম ক্ষেত্রে লেখা উচিত 'যদি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায়...' এবং অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখা উচিত 'যদি আপীল বিভাগের সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে না পাওয়া যায়...'। ৫৮-গ (৪) অনুচ্ছেদের সর্বশেষ লাইনের পূর্বের লাইনে একটি 'অনুরূপ' শব্দ লেখা হয়েছে। তার মতে, এ 'অনুরূপ' শব্দটি অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.২ গণভোট ও ত্রয়োদশ সংশোধনী
Refferendum and The Thirteenth Amendment

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে ৫৬ অনুচ্ছেদের (সংবিধানের প্রস্তাবনা, ৮, ৪৮ অনুচ্ছেদসহ) বিধানাবলির যে কোনো সংশোধনের জন্য গণভোটের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সাংবাদিক ও ভাষ্যকার মিজানুর রহমান খান বলেছেন, "দ্বাদশ সংশোধনী পাসের পর রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারো হাতে দেয়ার সুযোগ সংবিধানে রাখা হয় নি। ... প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনতে হলে ১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে গণভোটের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক।"[১৭]

তৎকালীন বি. এন. পি. সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, "দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক এ সংসদীয় গণতন্ত্র দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু গণভোটের মাধ্যমে এ সংশোধনী আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। মুহূর্তের জন্যও এ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে রহিত করে অগণতান্ত্রিক, অনির্বাচিত, অসংসদীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা কোনো গণভোট ছাড়া বৈধ হতে পারে না।"[১৮]

কিন্তু সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস হয় গণভোট ছাড়াই। এর ফলে সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয় নি। গণভোট না করার ক্ষেত্রে–

১। প্রথম যুক্তি হল - সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবলিত একটি নতুন পরিচ্ছেদ বিদ্যমান চতুর্থ ভাগের অধীনে ২য় পরিচ্ছেদের পরে '২ক পরিচ্ছেদ' সংযোজন করার মাধ্যমে গণভোটের বাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে (১) দফার (ক) উপ-দফায় সংবিধান 'সংশোধন' (amendment)-এর 'রূপ'(form) হিসেবে 'সংযোজন', 'পরিবর্তন', 'প্রতিস্থাপন' ও 'রহিতকরণ'কে নির্দেশ করা হয়েছে। আর বর্তমান ক্ষেত্রে সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ ও ৪টি অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি পরিচ্ছেদ 'সংযোজন' করা

---

১৭. মিজানুর রহমান খান, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৫, পৃঃ ৬-৭।
১৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মে, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এর ফলে সংবিধানের ৫৬ (৩) ও ৫৬ (৪) অনুচ্ছেদের বিধান অন্তত ৩ মাসের জন্য রহিত তথা সংশোধিত হচ্ছে। তাই সংবিধানের ১৪২ (১ক) অনুচ্ছেদের বিধানমতে এক্ষেত্রে গণভোটের আয়োজন বাধ্যতামূলক।[১৯]

২। দ্বিতীয় যুক্তি হল - সংবিধানের এ ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করার সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণভোট আয়োজনের অনুকূল ছিল না। সংবিধান ও আইনের দৃষ্টিতে এ যুক্তিটি গ্রহনযোগ্য নয়। কোন দল বা গোষ্ঠীর আবেগ-উচ্ছাস দ্বারা সংবিধানের বিধানকে লংঘন করার সুযোগ নেই। এ বাস্তবতায় প্রতিভাত হচ্ছে যে - সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীটি এখনও আইনে পরিণত হতে পারেনি এবং সংশোধনীটিকে আইনে পরিণত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করা বাধ্যতামূলক।[২০]

৬.২.৩ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিধি
Ministry of Defence and Scope of Caretaker Government

আধুনিক যুগে প্রতিরক্ষা কোন সহজ কাজ নয়। বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। বিদেশী কোন সংস্থা বা গুপ্তচর প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বা প্রশাসনে শত্রু ঢুকিয়ে দিয়ে যে কোন দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করতে পারে। তাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সরকারিভাবে সকল ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে নেয়ার মতো উপযোগী প্রশাসন বহাল থাকতে হয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলতে সেই সংস্থাকে বুঝায়, যারা দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। অর্থাৎ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত দেশের সম্মিলিত সেনা বাহিনীকে বুঝায়। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ হল –

(১) বহিঃশত্রুর হাত হতে দেশের স্থল, নদী ও আকাশ সীমানাকে রক্ষা করাই হল এর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

---

১৯. তারেক এম. টি. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮-৪৯।
২০. তারেক এম. টি. রহমান, ঐ, পৃঃ ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

(২) জরুরী পরিস্থিতিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দেশের প্রশাসন কার্যে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করা। যেমনঃ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে কখনও কখনও সেনা বাহিনী তলব করা হয়।

(৩) দেশে যখন বন্যা, সাইক্লোন ও ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, তখন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ব্যক্তিদের পূর্ণবাসনের উদ্দেশ্যে এ সামরিক বাহিনী একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে।

(৪) এ ছাড়াও অগণতান্ত্রিক হলেও দেশে যখন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন জনগণের নির্বাচিত সরকারের সকল কর্মকান্ড ও সাংবিধানিক ক্ষমতাকে স্থগিত রেখে সম্পূর্ণভাবে সামরিক আইন অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর প্রধান দেশ শাসন করে দেশে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং বলা যায়, এ প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশকে বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করার অতন্দ্র প্রহরী এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনের একটি শেষ স্থল। এ প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এ ছাড়াও, বাংলাদেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ দেশের বাইরে তাদের কর্মকান্ডের জন্য প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। এ দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দপ্তরটি অন্যান্য মন্ত্রণালয় অপেক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৬১ নং অনুচ্ছেদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী করা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে। এ সম্পর্কে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বলা হয় "In the constitution, in article 61 after the word law at the end the commas, words and figure and such law shall, during the period in which there is a Non-Party Caretaker Government under article 58-B, be administered by the presedent." এটি সত্যিকার অর্থেই একটি অপরিহার্য বিধান। এ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি যে কোন মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

এ সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ৫৮-ঙ তে আরও পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, "Certain provisions of the constitution to remain ineffective- Notwith standing anaything contained in articles 48 (3), 141-A(1) and 141-C(1) of the constitution, diring the period the Non-Party Caretaker

Dhaka University Institutional Repository

Government is function, provisions in the constitution requring the President to act on the advice of the Prime Minister or upon his prior counter-signature shall be ineffective."

এর ফলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্ব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের সংশোধনকে সংসদীয় ব্যবস্থায় অগ্রহনযোগ্য বলে মন্তব্য করে এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত করার দাবি জানায়। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রেখে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কারণ এটা সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে থাকলে সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হবে।"[২১]

অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নির্বাহী ক্ষমতা বিষয়ক আওয়ামী লীগের দাবির সম্পর্কে বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার বলেন, "কোন দলীয় উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয় নি। রাষ্ট্রপতি একজন নির্বাচিত ব্যক্তিই শুধু নয়, তিনি সুপ্রিম কমান্ডার। কাজেই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মত একটি স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয় শুধু রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়েছে। এতে সেনাবাহিনীর সুনাম ক্ষুন্ন বা অবমূল্যায়ন হয় নি।"[২২]

সুতরাং সার্বিক দিক থেকে বলা যায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির অধীনেই থাকা উচিত। কারণ যখন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু থাকে, তখন রাষ্ট্রপতিই একজন মাত্র ব্যক্তি যিনি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত। অন্য সকল উপদেষ্টাসহ প্রধান উপদেষ্টা কেউই নির্বাচিত নন, মনোনীত মাত্র। তাই প্রতিরক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় কখনোই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অধীনে থাকিতে পারে না।

---

২১. দৈনিক সংবাদ, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৬।
২২. দৈনিক সংবাদ, ২১ এপ্রিল ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ অনির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা এতই সংকুচিত যে, এ সরকার কোন নয়া-নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা রাখেন না। এমন কি কোন প্রতিশ্রুতি দেয়ার অধিকারও এ সরকারের নেই। শুধুমাত্র নির্বাচিত সরকারের অনুপস্থিতিতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করা এ সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ। অতএব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক প্রতিরক্ষার ন্যায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়টি রাষ্ট্রপতির ন্যায় দীর্ঘ মেয়াদী, অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নির্বাচিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অধীনেই থাকা উচিত।

৬.৩ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা
President and Chief Advisor

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথমত, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন, ১৯৯৬ অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টার যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তার দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহন করতে পারবেন। কিন্তু এ সংশোধনীর পূর্বে বাংলাদেশের সংবিধানে কোথাও উল্লেখ নেই যে, একজন প্রধান উপদেষ্টা তার দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহন করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়ত, আরো বলা হয়েছে যে, প্রধান উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা কখনই রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ দান করতে পারেন না। এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টা পদের যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি স্বীয় ক্ষমতা বলে তার নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যার মেয়াদকাল পাঁচ বছর। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একটি অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান, যার মেয়াদকাল মাত্র নব্বই দিন। এ মেয়াদ কাল রাষ্ট্রপতির মেয়াদ কালের বিশ ভাগের এক ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত, প্রধান উপদেষ্টাকে নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সংবিধানের ৫৮-খ (৩) বিধান মতে। কিন্তু আবার সংবিধানের ৫৮-খ (১) বিধান দ্বারা প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত করে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কোন ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার প্রধান উপদেষ্টার নেই। অথচ প্রধান উপদেষ্টার সকল ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার পরোক্ষ সুযোগ রাষ্ট্রপতির জন্যে রাখা হয় নি। শুধুমাত্র তাকে সরাসরি বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয় নি।

পঞ্চমত, বিশ্বে রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎপত্তির সাথে সাথে কখনও রাজা আবার কখনও বাদশা হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাই রাষ্ট্রপতি কথাটি রাষ্ট্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা একটি সুপ্রাচীন সংস্থা হিসাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের নিকট সমাদৃত। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা পদটি একেবারেই নতুন, যা কোন একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের জন্য কতিপয় রাজনৈতিক দলের মনোনীত পদ।

উপরিউক্ত আলোচনার পর বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নির্দলীয় ও অনির্বাচিত একজন সাময়িক সরকার প্রধানের ক্ষমতা পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ে বেশী হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

জনমত জরিপ ও সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ
Public Opinion Survey and Interview Analysis

গবেষণা একটি সমস্যা নিয়ে শুরু হয়, উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌছে। কোন গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আলোচ্য গবেষণায়ও গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যভিত্তিক পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মতামত জরিপ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া, গবেষণার গুণগত ও পরিমানগত উভয় পদ্ধতির সাহায্যে এবং বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের সাপেক্ষে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.১ উত্তরদাতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী
Information About Replier

আলোচ্য গবেষণার উত্তরদাতা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী নিচে সংযোজন করা হলোঃ

(১) উত্তরদাতাদের সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

আলোচ্য গবেষণায় পূর্ব পরীক্ষিত ৬টি প্রশ্নমালার আলোকে ২৫০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২০০ জন ছিল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এবং বাকি ৫০ জনের মধ্যে ছিলেন ৫জন সংবিধান বিশেষজ্ঞ, ১০ জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ১০ জন সাবেক উপদেষ্টা, ১৫ জন সাংসদ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ১০ জন স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। আলোচ্য অধ্যায়ে "বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ন ঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা"-এর উপরে প্রাপ্ত তথ্য পরিসংখ্যানিক বা সারণীবদ্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(২) উত্তরদাতাদের মতামত সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতা নির্বাচনে যতদূর সম্ভব লিঙ্গ সমতা বজায় রাখা হয়েছে। সমাজের সর্ব শ্রেণীর জনগণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জনসাধারণের মতামত জরীপে সর্বমোট ২০০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে যে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে ৪৫% ছিল মহিলা এবং বাকি ৫৫% ছিল পুরুষ। আর সমাজের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে ৫০ জনের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৬০% এবং মহিলা ছিলেন ৪০%।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) উত্তরদাতাদের বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতাদের বয়সসীমা ২০ হতে ৭০+ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ২০ থেকে ২৯ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন ৩০% উত্তরদাতা। এর পরই ছিল ৩০ থেকে ৩৯ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে ২০% উত্তরদাতা। ১৫% উত্তরদাতা ছিলেন ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে। ৫০ থেকে ৫৯ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন ১৪% উত্তরদাতা। ৬০ থেকে ৬৯ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন ১৬% উত্তরদাতা। আর ৭০ বছর বয়সের উপরে ছিলেন ৫% উত্তরদাতা। সারণীবদ্ধ বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এবং বয়সসীমা শ্রেণীবিন্যাসে বৈজ্ঞানিক রীতির আলোকে সর্বমোট বয়সসীমা ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করে নিম্নোক্ত সারণী-৭.১ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী-৭.১
উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা	উত্তরদাতা (%)
২০ থেকে ২৯	৩০%
৩০ থেকে ৩৯	২০%
৪০ থেকে ৪৯	১৫%
৫০ থেকে ৫৯	১৪%
৬০ থেকে ৬৯	১৬%
৭০(+)	৫%

(৪) উত্তরদাতাদের পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে এবং সঠিক তথ্য ত্রিভুজীকরণের (Triangulation) সুবিধার্থে বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর লোকজন থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সারণী-৭.২ অনুযায়ী পেশা ভিত্তিক প্রদত্ত সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী। অন্যদিকে পেশাজীবি বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের অগ্রাধিকার ছিল অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ নিজ নিজ পেশাগত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। তাই তাদের প্রদত্ত মতামত গবেষণর লক্ষ্যে পৌঁছাতে অত্যন্ত কার্যকরী অবদান রেখেছে। তাদের সাক্ষাৎকারে গবেষণার সমস্যাগুলোর অন্তর্নিহিত সমাধান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৭.২

পেশা অনুযায়ী উত্তরদাতা

	ব্যবহৃত টুলস	দিন মজুর	গৃহিনী	স্কুল শিক্ষক	বিশ্বঃ শিক্ষার্থী	স্কুল ব্যবসায়ী	এন.জি.ও কর্মকর্তা	ব্যবসায়ী	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি (সিটি ও পৌরঃ)	শিল্পপতি	সাংসদ	বিশ্বঃ অধ্যাপক	আইনজীবী	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য	রাজনৈতিক নেতা	সাবেক মন্ত্রী সদস্য	স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	মোট
১	সাধারণ জনগণ	৭	২৫	৪৫	৭৭	২৬	৬	৫	৪	২	-	-	-	-	৩	-	-	২০০
২	সংবিধান / আইন বিশেষজ্ঞ											২	৩					৫
৩	তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দায়িত্ব পালনকারী উপদেষ্টা													১০				১০
৪	বর্তমান/ সাবেক সংসদ/মন্ত্রী পরিষদ সদস্য/ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি								৩		৬				২	৪		১৫
৫	রাষ্ট্রবিজ্ঞানী											৬	২		২			১০
৬	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি								৬								৪	১০
		৭	২৫	৪৫	৭৭	২৬	৬	৫	১৩	২	৬	৮	৫	১০	৭	৪	৪	২৫০

(৫) উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ। উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে চারটি স্তর বা পর্যায়ে বিভক্ত করে পরিসংখ্যানিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণী-৭.৩ এ দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতাই (৯০%) ছিলেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, অপরপক্ষে সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতার (১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এস.এস.সি.-র চেয়ে কম।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭.৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্তর	সংখ্যা	হার (%)
এস.এস.সি.-এর নীচে	৭	১.০০%
এস.এস.সি.	১০	৩.১০%
উচ্চ মাধ্যমিক	১২	৫.৮৯%
উচ্চ শিক্ষা	২২১	৯০.০১%
মোট	২৫০	১০০%

৭.২ সাধারণ জনগণের মতামত
Opinion of General Population

গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী। তাদের মতামতের ভিত্তিতেই একটি দেশের শাসন কার্য পরিচালিত হয়। তাই আলোচ্য গবেষণায় সাধারণ জনগণের মতামতকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। নিচে সাধারণ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

(১) বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে বাঁধাসমূহ ঃ

বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কি কি বাঁধা রয়েছে - এ প্রশ্নের উত্তরে মতমতদানকারী সকলেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধাসমূহ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রধান বাঁধা হচ্ছে কালো টাকা ও অস্ত্র, সন্ত্রাস, প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা, রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ, স্থান বিশেষে বিশেষ দলের প্রভাব, জাল ভোট প্রদান, গণ-দারিদ্র ও প্রার্থী কর্তৃক ভোটক্রয়, নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব ইত্যাদি। নিম্নোক্ত সারণী-৭.৪ এ তা দেখানো হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭.৪
নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধাসমূহ

নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধাসমূহ	হার (%)
নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা	১৫%
নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব	২০%
প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা	১০%
রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ	৮%
কালো টাকা ও অস্ত্র	৭%
সন্ত্রাস	৮%
স্থান বিশেষে বিশেষ দলের প্রভাব	১১%
জাল ভোট প্রদান	১২%
গণ-দারিদ্র ও প্রার্থী কর্তৃক ভোটক্রয়	৯%
মোট	১০০%

(২) সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে জরুরি বিষয় সংক্রান্ত মতামত ঃ

যে কোন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে কোন বিষয়সমূহ বেশী জরুরি বা প্রয়োজন - এ প্রশ্নের উত্তরে মতমতদানকারী উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। নিম্নের সারণী-৭.৫ এ উত্তরদাতাগণের মতামত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হলো ঃ

সারণী-৭.৫
সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে জরুরি বিষয়সমূহ

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে জরুরি বিষয়সমূহ	হার (%)
১.রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সহনশীলতা	৩৫%
২.সরকারি পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার	২৭%
৩.শিক্ষার ব্যাপক প্রসার	১৮%
৪.সামগ্রিক নির্বাচনী নীতিমালা ও আইনের সংস্কার	১৩%
৫.সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৭%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণী-৭.৫ এ দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৫%) বলেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সহনশীলতা। এরপর শতকরা ২৭ জন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সরকারি পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ১৮% উত্তরদাতা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কথা বলেছেন। অন্যদিকে সামগ্রিক নির্বাচনী নীতিমালা ও আইন সংস্কারের পক্ষে মতামত দিয়েছেন ১৩% উত্তরদাতা এবং ৭% উত্তরদাতা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

(৩) নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব ঃ

নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন প্রভাব রয়েছে কি - এ প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ উত্তরদাতা (৮৮%)নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন প্রভাব রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ১০% উত্তরদাতা আংশিক প্রভাবের কথা বলেন। আর প্রভাব নাই বলেন ২% উত্তরদাতা। এ হার নিম্নের সারণী-৭.৬ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী-৭.৬

নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব	হার (%)
প্রভাব আছে	৮৮%
আংশিক প্রভাব আছে	১০%
প্রভাব নাই	২%
মোট	১০০%

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের উপর প্রভাব ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের উপর কোন প্রভাব ফেলে কি - এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ উত্তরদাতাদের অধিকাংশই বলেন, এ সময়ে ভোটদানের ক্ষেত্রে দলীয় সরকারের অধীনের তুলনায় তারা বেশী উৎসাহিত হন। তাই বেশীরভাগ উত্তরদাতাই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট দানে অনীহা প্রকাশ করেছেন। শতকরা ৯০ জনের মতামত অনুযায়ী সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। তাদের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয় বলে নিজেদের মতামত ভোটের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ থাকে, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভোটারদের উপস্থিতি বেশী থাকে। নিম্নোক্ত সারণী-৭.৬ এর মাধ্যমে এ হার তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী-৭.৭

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভোটদানের উপর প্রভাব

ভোটদানের উপর প্রভাব	হার(%)
প্রভাব আছে	৯০%
আংশিক প্রভাব আছে	৮%
প্রভাব নাই	২%
মোট	১০০%

(৫)) নির্বাচনে ভোট প্রদানে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ ঃ

নির্বাচনে ভোট প্রদানে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন - এ প্রশ্নের উত্তরে বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই মতামত দিয়েছেন যে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে ভোটদানের সময় যেসব সমস্যার সম্মুখীন তারা হয়েছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোটদানের সময় সেসব সমস্যার সম্মুখীন তাদের হতে হয় নি। নিম্নের সারণী-৭.৮ এ তা উল্লেখ করা হলোঃ

সারণী-৭.৮

ভোটপ্রদানে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ

ভোটপ্রদানে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ	তত্ত্বাবধায়ক সরকার (%)	দলীয় সরকার (%)	সর্বমোট হার (%)
ভোট পূর্বেই দেয়া হয়ে গেছে	১৪ (%)	২৫ (%)	৩৯%
বিশাল লাইন, কিন্তু কেউই বুথে যাচ্ছে না	৯ (%)	১২ (%)	২১%
ভোটার তালিকায় নাম নেই	১ (%)	২ (%)	৩%
বুথে ভোট দেয়ার গোপন কক্ষে বিশেষ দলের কোন এজেন্টের উপস্থিতি	৫ (%)	১০ (%)	১৫%
ভোট কেন্দ্রে না যেতে হুমকি বা বাঁধা প্রদান	৫ (%)	১০ (%)	১৫%
ভোট কেন্দ্র দখল	১ (%)	৬ (%)	৭%
মোট	৩৫ (%)	৬৫ (%)	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত সারণী-৭.৮ এর প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী উভয় সময়কালীন নির্বাচনে ভোটদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী যা ঘটে, তা হচ্ছে একজনের ভোট জাল করে অন্য জনের দিয়ে ফেলা । তাছাড়া যে কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যে যাদের ভোট পাবার সম্ভাবনা নেই, এরূপ ভোটাদের নাম ভোট লিস্টে চিহ্নিত করে ভোট শুরুর মধ্যেই জাল ভোট দিয়ে ফেলানোর ব্যবস্থা করে। ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভোট কেন্দ্রে না যাবার হুমকি দেয়া হয়। কিংবা বুথের ভিতর প্রভাবশালী প্রার্থীর এজেন্টের সম্মুখে ব্যালটে সিল মারার জন্য বাধ্য করা হয়। তুলনামূলকভাবে কেন্দ্র দখলসহ এরূপ ঘটনা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনেই অধিক ঘটে থাকে। নির্বাচনে শতকরা কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটে ৭%। এর মধ্যে ৬% ঘটে দলীয় সরকারের সময়কালে।

(৬) এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা উদ্ভবের কারণ ঃ

এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে অধিকাংশ মতামতদানকারী উত্তরদাতা (৭০%) বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। এ ছাড়া মতামতদানকারী উত্তরদাতাগণের আরো অনেকে আমলাদের দুর্নীতি, দলীয় সংশ্লিষ্টতা ও নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতামত নিম্নের সারণী-৭.৯ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী-৭.৯

নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রধান কারণ

নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রধান কারণ	হার(%)
দলগুলোর পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস	৭০%
আমলাদের দুর্নীতি	৯%
দলীয় সংশ্লিষ্টতা	৭%
নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা	১৪%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

(৭) তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে যে নির্বাচন হওয়া উচিত ঃ

এদেশে কোন কোন নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত - এ বিষয়ে **মতামতপ্রদানকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক** উত্তরদাতা (৭০%) মনে করেন সকল স্তরের নির্বাচনই তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত। কেননা এতে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে এবং ব্যয় কমবে। এছাড়া স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারি দলের প্রভাব থাকবে না। কিন্তু অপরদিকে ২৬% উত্তরদাতা মনে করেন, শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত। আবার ১% উত্তরদাতা বলেন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার নির্বাচন। কিন্তু শতকরা ৩ ভাগ উত্তরদাতা এ মতের বিরোধীতা করে বলেন, দেশের কোন নির্বাচনই তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রদত্ত মতামত নিম্নের সারণী-৭.১০ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী-৭.১০

তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে যে নির্বাচন হওয়া উচিত

নির্বাচনের প্রকৃতি	হার
সকল নির্বাচনই হওয়া উচিত	৭০%
শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২৬%
শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার নির্বাচন	১%
কোনটাই না	৩%

(৮) দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজন ঃ

দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজন কি সম্ভব - এ প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতাগণের ৭৮% ভাগ বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। কারণ ক্ষমতায় যারা থাকে তারা পুনরায় ক্ষমতায় আসার জন্য অনেক রকম অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট থাকে। তাই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজন সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। আর বাকি ৪% উত্তরদাতার মতামতের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে মিশ্রতা রয়ে দেখা যায়। তারা কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে দলীয় সরকারের অধীনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তবে তারাও দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ব্যপারে সন্দিহান বিধায় আপাতত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে। পরবর্তীতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র মজবুত ভিত্তি লাভ করলে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হবে না বলে মনে করেন।

(৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে ভোট প্রদানে পার্থক্য অনুভব ঃ

দুই সরকারের সময়ে ভোট প্রদানে কোন পার্থক্য রয়েছে কি - এর উত্তরে শতকরা ৮৯ জন উত্তরদাতাই স্পষ্ট ভাষায় দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট প্রদানে অনেক ধরনের পার্থক্যের কথা উচ্চারণ করেছেন। অপরদিকে শতকরা ১০ জন তেমন কোন পার্থক্য দেখতে পান নি বলে জানিয়েছেন। বাকি ১% মন্তব্য করতে চান নি।

(১০) সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প ঃ

সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কিছু হতে পারে কি - এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে ৯২% উত্তরদাতাই বলেছেন যে, এদেশের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে বাকি ৮% বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প হিসেবে দেশের নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে পারলেই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব।

(১১) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের মূল সুবিধাসমুহ ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের মূল সুবিধাসমুহ কি কি - এ প্রশ্নটি সাধারণ জনগণের করা হলে, তারা প্রায় সকলেই তাদের মতামত দেন এভাবে – তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন থাকে দলীয় প্রভাবহীন। নির্বাচনে ভোট দানে জনগণ থাকে স্বতঃস্ফূর্ত। নির্বাচন হয় সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব পালনে কতটা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করেন বলে আপনি মনে করেন - এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত জনগণের মতামত নিম্নের সারণী-৭.১১ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী-৭.১১

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা	হার (%)
পুরোপুরি স্বাধীন	২৪%
আংশিক স্বাধীন	৬৬%
একেবারেই স্বাধীন নয়	১০%
মোট	১০০%

(১৩) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ঃ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ কি কি - এ প্রশ্নের উত্তরে বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই (৩৭%) এ মতামত দিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এছাড়া দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে আরও যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজন বা অপরিহার্য বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন, সেগুলো নিচের সারণী-৭.১২ এ তুলে ধরা হল ঃ

সারণী-৭.১২

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ	হার (%)
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন	৩৭%
গঠনমূলক রাজনীতি	২০%
শিক্ষার প্রসার	১৮%
গঠনমূলক বিরোধীতা	৯%
নিরপেক্ষ প্রশাসন	১১%
পারস্পরিক সহনশীলতা	৫%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

১৪) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষমতা ঃ

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষম হয়েছিল কি না - এ প্রশ্নটি সাধারণ জনগণের করলে তাদের ২৯% এর পক্ষে মত প্রদান করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ উত্তরদাতা (৬১%) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে আংশিক সক্ষম হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ১০% উত্তরদাতা বলেন ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে একেবারেই সক্ষম হয় নি। নিম্নের সারণী-৭.১৩ তে এ হার দেখানো হলো ঃ

সারণী-৭.১৩

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষমতা

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষমতা	হার (%)
পুরোপুরি সক্ষম হয়েছিল	২৯%
আংশিক সক্ষম হয়েছিল	৬১%
একেবারেই সক্ষম হয় নি	১০%
মোট	১০০%

(১৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে –

ক.দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে উন্নত/ মোটামুটি/ একই থাকে/ অধঃপতন ঘটে।

সারণী-৭.১৪

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি	হার (%)
তুলনামূলকভাবে উন্নত	৭৯%
মোটামুটি উন্নত	১৮%
একই থাকে	৩%
অধঃপতন ঘটে	০%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

খ.আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পুরোপুরি উন্নতি ঘটে/ আংশিক উন্নতি ঘটে/ একই থাকে/ অবনতি ঘটে।

সারণী-৭.১৫

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	হার (%)
পুরোপুরি উন্নতি ঘটে	৬৫%
আংশিক উন্নতি ঘটে	৩১%
একই থাকে	৪%
অবনতি ঘটে	০%
মোট	১০০%

গ.নির্বাচন কমিশন অধিক স্বাধীনভাবে কাজ করে/ আংশিক স্বাধীনভাবে কাজ করে/ একই রকম কাজ করে/ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

সারণী-৭.১৬

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা	হার (%)
অধিক স্বাধীনভাবে কাজ করে	৫৬%
আংশিক স্বাধীনভাবে কাজ করে	৩৪%
একই রকম কাজ করে	৮%
স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না	২%
মোট	১০০%

ঘ.পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে / আংশিক নিরপেক্ষভাবে কাজ করে / একই রকম থাকে / নিরপেক্ষতা হারায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭.১৭

পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা

পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা	হার (%)
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে	৭৩%
আংশিক নিরপেক্ষভাবে কাজ করে	২৩%
একই রকম থাকে	৪%
নিরপেক্ষতা হারায়	০%
মোট	১০০%

৭.৩ সংবিধান বা আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার
Interview of Constitution or Law Specialist

আলোচ্য গবেষণাটি যেহেতু সাংবিধানিক, তাই গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতাকে সাংবিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে খতিয়ে দেখার জন্য সংবিধান বা আইন বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৫ জন সংবিধান বা আইন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে। নিচে তাদের সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণ ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আইন বা সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ একাধিক বিষয় তুলে ধরেছেন। বেশিরভাগ সংবিধান বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবীই মনে করেন, দলীয় সরকারের অধীনে কারচুপিপূর্ণ নির্বাচনই এ ধারণার উৎপত্তিতে সাহায্য করেছে। কেননা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোন কারচুপি, পক্ষপাতিত্ব থাকে না। এ সময় ভোটারদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে এবং ভোটারগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। তাই আইন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বিগত ৩টি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনসমুহ সম্পন্ন হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি বাংলাদেশে স্থায়ী রূপ নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনোনীত ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন ঃ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনোনীত ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধিকাংশ আইন বিশেষজ্ঞই (৯০%) এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। তারা বলেন, এ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করে এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অতএব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবশ্যই গ্রহনযোগ্য। কিন্তু অপরদিকে বিরোধী আইন বিশেষজ্ঞগণ (১০%) এ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করে বলেন, এ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং বিরোধী।

(৩) বাংলাদেশের সংবিধানের মৌল নীতি '১১ নং অনুচ্ছেদ'-এর সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণতা ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌল নীতি '১১ নং অনুচ্ছেদ'-এর সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ-এ প্রশ্নটি সংবিধান বিশেষজ্ঞদের করা হলে, সাক্ষাৎকার দানকারী ৫ জন সংবিধান বিশেষজ্ঞের মধ্যে ৪ জনই বলেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা কোনভাবেই এ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত না হলেও, এ সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদে শুধুমাত্র জাতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালীন সময়ের জন্য কাজ করে। অন্যদিকে অপর একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে সংবিধানের '১১ নং অনুচ্ছেদের' পরিপন্থী বলে মনে করেন। তিনি বলেন, সংবিধানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা সংক্রান্ত যে ঘোষণা রয়েছে, এখানে তা অবজ্ঞা করা হয়েছে।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগ বা গঠন প্রক্রিয়া ঃ

আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ উত্তরদাতাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা নিয়োগ বা গঠন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছেন। তারা বলেন, সংবিধানের ৫৮-গ অনুচ্ছেদের ১নং দফা পর্যন্ত উপদেষ্টাদের নিয়োগ সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে, তা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। এর কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে ১০% উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা নিয়োগ বা গঠন প্রক্রিয়াকে সঠিক নয় বলে মত প্রকাশ করেন। তারা উপদেষ্টার সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের বিচার বা অপসারণ ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের বিচার বা অপসারণ প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করতে গিয়ে সকল আইন বিশেষজ্ঞই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনী সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন সদস্য মনোনয়ন ও শপথ গ্রহনের পর তার বিরুদ্ধে যদি কোন পক্ষপাতিত্ব বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় বা প্রমাণিত হয়, তাহলে আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের কোন সুযোগ নেই। কারণ এ সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট বিধান সংবিধানে নেই বা থাকলেও তা অস্পষ্ট। তাই এ সম্পর্কে নতুন বিধান সংবিধানের সংযোজিত করা উচিত।

(৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা ঃ

অধিকাংশ সাক্ষাৎকারদানকারী সংবিধান বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের মতে, নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। ফলে এ সরকারের উপদেষ্টাগণ কোন দলের সাথে সংযুক্ত থাকে না বিধায়, এদের সকল কর্মকান্ডই নিরপেক্ষ হয়। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সরকার। তবে কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা বলেন, দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে কোন ব্যক্তির পক্ষেই একশতভাগ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে, কিন্তু এ সরকার দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষ থাকবে –এ কথা মেনে নেয়া যায় না। কেননা, তাদেরও নিজস্ব মতাদর্শ রয়েছে। তারাও কোন না কোন ব্যক্তি বা দলকে ভোট দিয়ে থাকেন। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে করা যায় না।

(৭) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর জন্য গণভোটের প্রয়োজনীয়তা ঃ

অধিকাংশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনবেত্তাগণ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলটিকে আইনে রূপান্তরিত করার জন্য গণভোটের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন। তারা মনে করেন, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর জন্য গণভোটের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন সংশোধনী আনা হয় নি। এসব অনুচ্ছেদে সংশোধনীর জন্য গণভোটের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে বিরোধী আইন বিশারদগণ মনে করেন,

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলটি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল, তাতে বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য গণভোটের প্রয়োজন ছিল। কারণ সংসদে কোন সংশোধনী বিল পাস হলেই রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিতে পারেন না, যদি ঐ বিল সংবিধানের একটি মৌলিক কিছু পরিবর্তন ঘটাতে চায়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস করাও সংবিধানের একটি মৌলিক বিষয়। তাই এ ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন ছিল।

(৮) নির্বাচন কমিশনের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণ ঃ

আইনগতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে - এ প্রশ্নের উত্তরে আইন বিশেষজ্ঞগণ বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। স্বাধীন সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে শপথের দ্বারা দায়বদ্ধ। নির্বাচন কমিশন যদিও স্বাধীন সংস্থা, তথাপি এ কমিশনের উপরে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণ থেকেই যায়। কেননা রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী। ফলে কমিশন নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। যদিও আইনগতভাবে নির্বাচন কমিশনের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। শুধুমাত্র নির্বাচন পরিচালনার জন্য সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করাই এ সরকারের কাজ। তারপরও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে গঠিত নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য কোন কর্মচারীর প্রয়োজন হলে, কর্মচারী প্রদানের ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতে অর্পণ করা সমীচীন। সর্বোপরি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠণের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতেই থাকা উচিত।

(৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর থাকে কি না - এ প্রশ্নের জবাবে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনবেত্তাগণের প্রায় সকলেই বলেন, এ সরকারের উপস্থিতিতে সংসদীয় পদ্ধতি কার্যকর থাকতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা উত্তম ব্যবস্থা কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থায় যারা বিশ্বাসী তারা জানেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনোই সংসদীয় ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে, এ সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় ব্যবস্থার মূল ধারণার পরিপন্থী। তারপরেও অনেক বিশেষজ্ঞ এ ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনকালীন সময়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নির্বাচন কমিশনের উপর ক্ষমতাসীন দলের খবরদারি এবং নির্বাচনকালীন সময়ে প্রশাসনকে সরকারি দলের আজ্ঞাবহ রাখা ইত্যাদি কারণেই বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি জন্ম নিয়েছে। আর ১০% উত্তরদাতা বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি জন্ম হবার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধকে দায়ী করেছেন।

(৩) উন্নত বিশ্বে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব হলেও বাংলাদেশে নয় ঃ

উন্নত বিশ্বে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব হলেও বাংলাদেশে নয় কেন - এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একই কথা বলেন। তাদের মতে, উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। সে সকল দেশসমূহের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা হয়। তাছাড়া উন্নত দেশসমূহে দলীয় সরকার নির্বাচনকালীন সময়ে কখনোই নির্বাচনের ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করেনা। অথচ বাংলাদেশে এর ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। এ দেশের মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। এ দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ বিকাশ লাভ করে নি। তাছাড়া বাংলাদেশের কোন দলীয় সরকারেরই নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার মতো মানসিকতা নেই। আবার কোন বিরোধী দলেরই নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেয়ার মতো রেওয়াজ চালু নেই। দলীয় সরকারের অধীনে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই পরাজয়কে হাসি মুখে মেনে নেয়া, জনগণের ম্যান্ডেটকে সম্মান জানানো এবং বিজয়ী প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানানো ইত্যাদি বিষয় এ দেশে প্রচলিত নেই।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি-না ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা - এ প্রশ্নটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের করা হলে তাদের ৭০% উত্তরদাতা প্রশ্নের পক্ষে মত প্রদান করেন। তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের ফলে বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচন ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাতে বসেছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানে লিপিবদ্ধ হওয়ায় নির্বাচন ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা ফিরে এসেছে। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিগত ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে এর প্রমান পাওয়া গেছে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা। অন্যদিকে ৩০% উত্তরদাতা এর আংশিক বিরোধীতা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা নয়। কারণ যদিও এ সরকারের কাজ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, কিন্তু এ সরকার যে সবসময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে যথেষ্ট কি-না ঃ

আপনি কি মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে যথেষ্ট- এ প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৮০ ভাগ উত্তরদাতাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেঁধে দেয়া সময়সীমাকে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে যথেষ্ট বলে মনে করেন। তাদের মতে, যদিচ্ছা থাকলে নব্বই দিনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ২০% ভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নির্বাচন আয়োজনে বেঁধে দেয়া সমসসীমাকে যথেষ্ট বলে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নব্বই দিন কোনভাবেই যথেষ্ট হতে পারে না। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদের কিছু সময় দেয়া প্রয়োজন। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ১২০ দিন করা উচিত।

(৬) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর গণতান্ত্রিক ভিত্তি ঃ

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান করা হয়েছে, তা কতটা গণতন্ত্রসম্মত - এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৮০ ভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তারা বলেছেন, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ৮, ৪৮ এবং ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন সংশোধন হয় নি। তাই এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোতে কোন প্রভাব ফেলে নি। এর ফলে গণতন্ত্র সুসংহত হয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আইনগত রূপ লাভ করেছে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ২০% এর বিরোধিতা করেছেন। তারা মনে করেন, এতে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠনের বিধান থাকলেও ত্রয়োদশ সংশোধনীতে এর ব্যাতিক্রম ঘটানো হয়েছে। অর্থাৎ অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠনের বিধান করা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত নয়।

(৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কার হাতে থাকা উচিত - এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই (৮০%) বলেন, ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ৬১ নং ধারায় পরিবর্তন সাধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রতিরক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এটা অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্ত। কেননা, রাষ্ট্রপতি একজন নির্বাচিত ব্যক্তি। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচিত নন, মনোনীত মাত্র। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল পাঁচ বছর, আর অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের মেয়াদকাল মাত্র তিন মাস। তাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রতির হাতেই থাকা উচিত। এতে দেশ ও জাতি নিরাপদ ভোগ করে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (২০%) প্রতিরক্ষা বিষয়ক নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতেই ন্যস্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

(৮) স্বীকৃত মডেল হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মূল্যায়ন ঃ

একটি স্বীকৃত মডেল হিসেবে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই এ ব্যবস্থার সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার কথা বলেন। বাংলাদেশের আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের উদাহরণ দেখা যায়। তবে সে সকল দেশে ক্ষমতাসীন বা দলীয় সরকারকেই এ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশেই প্রথম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করা হয়েছে, যা সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছে। নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন মডেলের সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক স্বীকৃত নতুন মডেল হলো এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। তাই বিশ্বের অনেক দেশই এ ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য ঃ

আপনার মতে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য কি - এ প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন, একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য নিহিত এর সুষ্ঠু পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহনের উপর, যা একে একটি নিরপেক্ষ সরকার কাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে বিচারপতি হাবিবুর রহমান এবং তার উপদেষ্টা পরিষদ যা করে দেখিয়েছেন তাতে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিশ্বের বহুদেশ থেকে যে সমস্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষক এ দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষন করেন তারা সকলেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এর অবাধ ও নিরপেক্ষতার বিষয়ে শতভাগ সাফল্যের ঘোষণা করেন। এক কথায়, বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এটাই ছিল বাস্তব গণতন্ত্রসম্মত একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। আর ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল সাফল্য এতেই নিহিত।

(১০) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহতকরণে ভূমিকা পালন ঃ

আপনার মতে ১৯৯৬ সালের বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করতে কি ভূমিকা পালন করেছিল - এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। তারা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনকে আগামী দিনের প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য একটি মডেল হিসেবে গ্রহন করার পরামর্শ দেন। অনেকে একে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথ পরিক্রমার প্রথম সোপান বলেও মন্তব্য করেন। পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক চর্চার দিকে অগ্রসর হতে হলে সর্বপ্রথম মানুষের যে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারটি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক, তা হলো ভোটের অধিকার সংরক্ষন। আর সে ক্ষেত্রে এ সরকার একটি উত্তম উদাহরণ। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনের শাসন ও সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫ উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার
Interview of Advisors

গবেষণাটি যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্ভর, তাই আলোচ্য গবেষণায় দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের মধ্য থেকে ১০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা করে তা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। নিচে এগুলো প্রদত্ত হলো ঃ

(১) নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় বিষয় ঃ

নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন - এ প্রশ্নটি উপদেষ্টাদের করা হলে শতকরা ৭০ ভাগ উত্তরদাতাই একবাক্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার কথা উচ্চারণ করেন। তারা বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহনশীলতা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কেননা, সহনশীলতা এমন এক বিষয় বা উপাদান, যা গণতন্ত্রের ভিত্তি। আর গণতন্ত্রের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল নিরপেক্ষ নির্বাচন। অন্যদিকে ২০% উত্তরদাতা প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ নির্বাচনী নীতিমালা ও আইন সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহলেই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। আর শতকরা ১০ জন উত্তরদাতা নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সরকারি পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পক্ষে মতামত দেন।

(২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণার জন্ম সংক্রান্ত মতামত ঃ

প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণ আস্থা হারাতে বসেছিল বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে - এ প্রশ্ন উপদেষ্টাদের করা হলে তারা সকলেই প্রশ্নের স্বপক্ষেই উত্তর প্রদান করেছেন। উপদেষ্টাগণ একবাক্যে বলেন, বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে যত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার কোনটি এদেশের জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পায় নি। কেননা, কোন দলীয় সরকারই নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয় নি। ফলে জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, কোন দলীয় সরকারের অধীনেই এদেশে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই এসব কারণেই প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণ আস্থা হারাতে বসেছিল বলেই তত্ত্বাবধায়ক ধারণার জন্ম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন আয়োজনের সময়সীমা ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন আয়োজনের জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত কিনা - এ প্রশ্নের জবাবে ৯০% উপদেষ্টাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেঁধে দেয়া সময়সীমাকে পর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে নব্বই দিনই যথেষ্ট। কিন্তু অপরদিকে শতকরা ১০ ভাগ উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন আয়োজনে বেঁধে দেয়া সমসসীমাকে অপর্যাপ্ত মনে করেন। তাদের মতে নব্বই দিন কোনভাবেই একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

(৪) নির্বাচনী অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরীকরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা ঃ

নির্বাচনী অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরীকরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা কতটুকু আইনসম্মত - এ প্রশ্নের আলোকে মতামতদানকারী উপদেষ্টাগণ নির্বাচনী অনিয়ম দূরীকরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই আইনসম্মত বলে মনে করেন। কারণ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই এ সরকার গঠিত হয়। তাই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যদি কোন দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে তা দূর করাও এ সরকারেরই কাজ। আর এ কাজ কোনভাবেই আইন বিরুদ্ধ হতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে কিছু আইনী সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। কেননা সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে।

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর জনগণের ম্যান্ডেট ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর জনগণর ম্যান্ডেট রয়েছে কি না -এ প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সকল উপদেষ্টাই ইতিবাচক মত প্রদান করেন। তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদিও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার নয়, তথাপিও এ সরকারের উপর জনগণের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে। জনগণও এ ব্যবস্থারই পক্ষে। জনগণ ও রাজনেতিক দলগুলোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিই এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছিল, যাতে দেশের সকল মানুষেরই সম্মতি ছিল। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উপর জনগণের ম্যান্ডেট অবশ্যই রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূকরণে গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসূকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়- এ প্রশ্ন করা হলে, উপদেষ্টাগণ সকলেই নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলেন। তাদের মতে, সংবিধানের ৫৮-ঘ অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে হলে এর কার্যাবলির সম্প্রসারণ ঘটানো উচিত। নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও রাষ্ট্রপতির অধীনে না রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতেই থাকা উচিত। উপদেষ্টাগণ আরো বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের ক্ষমতাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতেই দেয়া উচিত। তাহলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আরো ফলপ্রসূ হবে।

(৭) যে সমস্ত নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত ঃ

কোন কোন নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত - এ বিষয়ে মতামত প্রদানকারী ১০ জন উপদেষ্টার মধ্যে ৯০% উপদেষ্টা বলেন, গণতন্ত্র বিকাশে শুধু কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনই গুরুত্বপূর্ন নয়, স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান মাধ্যম হলো তৃনমূল পর্যায়ে ক্ষমতায়ন। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নির্বাচনে দলীয় প্রভাব এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার ও রাজনৈতিক দল যে পন্থা অবলম্বন করে, তাতে করে নির্বাচন হয়ে উঠেছিল হতাশাব্যঞ্জক। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নির্বাচনে দলীয় প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই তাদের মতে, সকল পর্যায়ের নির্বাচনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত। এতে করে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে, ব্যয় কমবে এবং স্থানীয় নির্বাচনে সরকারি দলের প্রভাব থাকবে না। অন্যদিকে শতকরা একজন উপদেষ্টা শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকাকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনে উদ্ভূত সমস্যাসমূহঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকাকালীন সময়ে আপনাদেরকে দায়িত্ব পালনে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে - এ প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টাগণ সকলেই বলেন যে, ক্ষমতা গ্রহনের পর প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়নে তাদেরকে বিশাল সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী দলীয় সরকার প্রশাসনের সর্বস্তরে তাদের নিজস্ব দলীয় ব্যক্তিবর্গ বা আমলাদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন, ফলে তারা প্রশাসনের উপর অনেকক্ষেত্রে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন নি, যা তাদের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঁধা হিসেবে কাজ করেছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে সমস্যা হিসেবে কাজ করেছে। কোন কোন উপদেষ্টা বলেন, এক একজন উপদেষ্টার অধীনে একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থাকাতে অধীনস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের রুটিন মাফিক কাজ করা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কেননা এর জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। মূলতঃ উপদেষ্টাগণ যে সকল সমস্যার কথা বলেছেন, সেগুলো হচ্ছে- নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনী সীমাবদ্ধতা তাদেরকে অনেক ব্যবস্থা গ্রহনে বাঁধা হিসেবে কাজ করেছে। তাছাড়া সাধারণ জনগণের বিশাল প্রত্যাশা সবসময় তাদের উপরে একটি নৈতিক বা মানসিক চাপ হিসেবে কাজ করেছে।

(৯) নির্বাচন কমিশনের উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ

নির্বাচন কমিশনের উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ কতটা ছিল - এ প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টাগণ বলেন, সংবিধানের ৫৮-খ অনুচ্ছেদের (২) দফায় উল্লেখ রয়েছে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হবে, নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবেন। তারা জানান, আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচন কমিশনের উপর তাদের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে রকম সহযোগিতা করা দরকার, নির্বাচন কমিশনকে তারা কেবল সে রকম সহযোগিতাই করে গেছেন। আর সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তারা নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। তারা আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্যকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠিত করার মত কোন ক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না। কেননা, তাদের ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই নির্দিষ্ট করা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সমুন্নতকরণে ভূমিকা ঃ

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সমুন্নত করতে কি ভূমিকা রেখেছিল - এ প্রশ্নের আলোকে মতামত প্রদানকারী উপদেষ্টাগণের ৭০% বলেন, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতন্ত্রকে সমুন্নত করতে অনেক ভূমিকা পালন করেছিল। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংরক্ষিত করেছিল। অন্যদিকে ২০% উত্তরদাতা ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতন্ত্রকে সমুন্নত করতে সীমিত ভূমিকা পালন করেছিল বলে মত প্রকাশ করে। আর উত্তরপ্রদানকারী ১০% উপদেষ্টা বলেন, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতন্ত্রকে সমুন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

৭.৬ রাজনীতিবিদ, সাংসদ ও মন্ত্রীদের সাক্ষাৎকার
Interview of Politician, MP and Minister

গণতন্ত্রে রাজনীতিবিদগণ মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাদের কেউ সাংসদ, কেউ বা কোন রাজনৈতিক দলের সাধারণ নেতাকর্মী ,আবার কেউ বা মন্ত্রী। তাই তাদের দৃষ্টিতে আলোচ্য গবেষণাটিকে গভীরতা দানের জন্য ১৫ জন রাজনৈতিক নেতা কর্মী, সাংসদ ও মন্ত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে এবং তা পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিচে তাদের প্রদত্ত মতামত উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) নিরপেক্ষ নির্বাচনে এ দেশে বাঁধাসমূহ ঃ

নিরপেক্ষ নির্বাচনে এ দেশে বাঁধাসমূহ কি কি - এ প্রশ্নের জবাবে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সাংসদ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাগণ বিভিন্ন বাঁধা বা সমস্যার কথা বলেন। অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রধান বাঁধাসমূহ হচ্ছে- প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা, কালো টাকার দৌরাত্ম, গণ-দারিদ্র ও প্রার্থী কর্তৃক ভোট ক্রয়, শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন জনগণের অভাব, সন্ত্রাস ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের দাপট, নির্বাচন কমিশনের উপর সরকারি দলের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। উত্তর প্রদানকারী কেউ কেউ আবার নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, জাল ভোট প্রদান, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাবকে বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রধান বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন ঃ

দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি না - এ প্রশ্ন নিয়ে উত্তরদাতাগণের মধ্যে দ্বিমত দেখা গেছে। উত্তরদাতাগণের শতকরা ৮৫ ভাগের মতে, দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। কেননা, কোন দলীয় সরকারই নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে না। অন্যদিকে ১৫% উত্তরদাতা মনে করেন, দলীয় সরকারের অধীনেও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা রাজনৈতিক নেতাগণ পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের উদাহরণ টেনে বলেন, ভারতে সব সময় দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মতে, দেশে যদি নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে তুলে একে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া যায়, তবে দলীয় সরকারের অধীনেও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব, সে ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হয় না।

(৩) বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভবের কারণ ঃ

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভবের কারণ কি - এ সম্পর্কে রাজনীতিবিদগণের মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তারা উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিই নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থাহীনতাকেই এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভবের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বলেন যে, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অস্বচ্ছ ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য। সেখানে নিরপেক্ষ নির্বাচন কখনোই আশা করা যায় না। তাই নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব। অন্যদিকে কোন কোন উত্তরদাতা বলেন, জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার জন্যই এ সরকারের উদ্ভব। আবার কেউ কেউ নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা ও এর উপর সরকারি দলের কঠোর নিয়ন্ত্রণকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ বলে মনে করেন।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন সংবিধানের লংঘন কি-না ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন সংবিধানের লংঘন কি না - এ প্রশ্ন সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে করা হলে, তাদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। উত্তরদাতাগণের শতকরা ৭৬ ভাগই মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের লংঘন নয়। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নিরপেক্ষ অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছে, তা কোনভাবেই সংবিধানের লংঘন করে করা হয় নি। তারা আরও বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান যদি সংবিধানের লংঘনই হয়, তাহলে এ বিধান মতে এ পর্যন্ত যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার সবই অবৈধ হয়ে পড়বে। অপরপক্ষে উত্তরদাতাগণের ২৪% মনে করেন, আইনটি সংবিধানের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে তারা কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেন। যথা ঃ (ক) অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, (খ) গণভোট না করে এ আইন পাস করানো ইত্যাদি – কারণে এটি সাংবিধানিক কাঠামোর পরিপন্থী।

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব কি হওয়া উচিত - এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ এবং সংসদ ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণের অধিকাংশই বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হচ্ছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা বা এর জন্য প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা। তাদের অপর গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা। এ সম্পর্কে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত তা উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে কতিপয় উত্তরদাতা এ সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদকালে সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা এবং নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটিয়ে নির্বাচন যাতে কোন প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন না হয় তার সুচারু ব্যবস্থা করাও এ সরকারের একটি পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করেন।

(৬) সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না কি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন ঃ

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন ধরণের মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের শতকরা ৭০ ভাগের মতামত মোটামুটিভাবে এ রকম যে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের অনুষ্ঠানে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরই অধিক প্রয়োজন। কারণ, এ সরকারে যারা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত হন তারা সাধারণতই দল

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তাদের প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা থাকে বেশী। তা ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্বই হচ্ছে একটি সফল, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। এটা তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জও বটে। আবার বাকিদের মধ্যে ২০% উত্তরদাতা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের উপর। তাদের মতে, নির্বাচন কমিশন যদি স্বাধীন ও সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে, তাহলে দলীয় সরকারের অধীনেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। অপর ১০% উত্তরদাতা মনে করেন, এমন একটি কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে একদিকে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি তার সাথে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করে দেয়াও অত্যন্ত প্রয়োজন।

(৭) অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ঃ

অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন –তাত্ত্বিক দিক থেকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন - এ প্রশ্নের উত্তরে রাজনীতিবিদ, সাংসদ ও মন্ত্রীগণের অধিকাংশই বলেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদিও জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার নয়, কিন্ত এ ব্যবস্থার প্রতি জনগণের জনগণের আস্থা রয়েছে। এ সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্টে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। অপরপক্ষে বিরোধী উত্তরদাতাগণ বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারকে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার নয়। তাই অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব নয়।

(৮) সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প ঃ

সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কি হতে পারে - এ বিষয়ে উত্তরদাতাগণের মতামত জানতে চাওয়া হলে, তাদের শতকরা ৮৫ ভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন যে, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন বিকল্প নেই। অপরপক্ষে তাদের ১৫% তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করে দেয়া এবং তাকে দলীয় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার কথা উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কার হাতে থাকা উচিত - এ প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী পন্থী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ এবং সংসদ ও মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্যগণের ৫৫% ভাগ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টার হাতেই থাকা উচিত, রাষ্ট্রপতির হাতে নয়। তাই তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বিভাগ রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তরের দাবি জানান। অন্যদিকে বি.এন.পি. পন্থী ৩৫% উত্তরদাতাগণ মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল কর্তৃত্ব প্রধান উপদেষ্টার হাতে নয়, রাষ্ট্রপতির হাতেই থাকা উচিত। কারণ রাষ্ট্রপতি একজন নির্বাচিত ব্যক্তি।

(১০) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা ঃ

আপনি কি মনে করেন ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেছিল - এ প্রশ্নটি সম্পর্কে আওয়ামী পন্থী ও বি.এন.পি. পন্থী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সংসদ ও মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্যগণের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ আওয়ামী পন্থী উত্তরদাতাগণ ইতিবাচক মন্তব্য করেন, অন্যদিকে বি.এন.পি. পন্থী উত্তরদাতাগণ নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ আওয়ামী পন্থী রাজনীতিবিদ, সাংসদ ও মন্ত্রীগণের সকলেই বলেন, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেছিল। আর বি.এন.পি. পন্থী রাজনীতিবিদ, সাংসদ ও মন্ত্রীগণ বলেন, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে নি।

৭.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার
Interview of Representatives of Local Government

সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদেরকে বাংলাদেশ সংবিধানের বিধান মোতাবেক 'স্থানীয় সরকার' বলে অভিহিত করা হয়। ফলে গবেষণার প্রয়োজনে এখানে নির্ধারিত ও পূর্ব নির্বাচিত প্রশ্নের আলোকে ছাপানো কাগজের মাধ্যমে কতিপয় অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের ১০ জন সদস্যের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। নিচে এগুলো বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিগণের প্রায় সকলেই এ ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেছেন। তারা বলেন, ক্ষমতাসীন দল বা সরকারি দল যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনের ফলাফলের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে এ মহান উদ্দেশ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের জনগণ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করতে পারে। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকেই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাত্র কিছুসংখ্যক উত্তরদাতা এর বিপক্ষে কথা বলেছেন।

(২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন এবং দেশ পরিচালনা ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন এবং দেশ পরিচালনা সম্পর্কে অভিমত প্রদান করতে গিয়ে স্থানীয় প্রতিনিধিদের ৮০% ভাগ ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। তারা বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাই উত্তম ব্যবস্থা। কারণ এখানে দেশ পরিচালনা মূখ্য বিষয় নয়, মূখ্য হচ্ছে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন ও সরকার গঠনে সহায়তা প্রদান। অপরদিকে ভিন্নমত পোষণকারী শতকরা ২০ ভাগের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে অক্ষম। কারণ তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। দেশ পরিচালনা করতে অক্ষম ও রাজনীতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শাসনকালে দেশে যে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

(৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচনের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ে কি না - এ প্রশ্নের উত্তরে ৯০% উত্তরদাতাই মনে করেন, দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে জনগণ ভোটদানে স্বতঃস্ফূর্ত থাকে। প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। তাই নির্বাচন বর্জনের হার এ সরকারের সময় তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এ ছাড়া এ সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহন কম থাকে, তেমনি অংশগ্রহনকারী প্রার্থীর সংখ্যাও কম থাকে। মোট কথা, তাদের মতে, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দলীয় প্রভাবই ব্যাপক লক্ষ্যণীয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে তা সম্ভবপর নয়। অপরদিকে শতকরা ১০ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, উভয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

(৪) বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনে আবশ্যকতা ঃ

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর অধীনে নির্বাচন আয়োজনের কোন রূপ আবশ্যকতা রয়েছে কি না - এ প্রশ্ন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের করা হলে তাদের ৮০% উত্তরদাতাই মনে করেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা, একমাত্র নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কখনোই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বেড়ে গেছে এবং বিভিন্ন দেশে এ সরকার ব্যবস্থা গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। অপরপক্ষে ২০% উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন না করেও তারা বলেন, দলীয় সরকারের অধীনেও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে তারা নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন।

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার দায়িত্ব পালনে কতটা স্বাধীন বলে আপনি মনে করেন - এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বলেন, এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব পালনে অনেকাংশেই স্বাধীন নয়। কারণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অনেক নিয়ন্ত্রণ থাকে। প্রতিরক্ষা বিভাগ ও জরুরী ক্ষমতা আইনও রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকায়, শুধুমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আর কোন ক্ষমতা নেই। তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবকিছুতেই রাষ্ট্রপতির নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। বস্তুত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রতিরূপ মাত্র। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নির্দিষ্ট ৯০ দিনের সময়সীমা নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে পর্যাপ্ত কি-না ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নির্দিষ্ট ৯০ দিনের সময়সীমা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য কি পর্যাপ্ত - এ প্রসঙ্গে মতামত দিতে গিয়ে শতকরা ৭০ ভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বলেন, সৎ উদ্দেশ্য থাকলে ৯০ দিনেও একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব। কিন্তু অপরপক্ষে ৩০ ভাগ উত্তরদাতা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যারা থাকেন তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ। তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য হলেও আরও বাড়তি কিছু সময়ের প্রয়োজন। তাই অভিজ্ঞতার অভাবে অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে ৯০ দিনের সময়সীমা কোনভাবেই একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে না।

(৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ ঃ

আপনার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে কিভাবে আরো শক্তিশালী করা যায় - এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। তাদের অর্ধেক উত্তরদাতা মনে করেন, এক্ষেত্রে প্রথমেই যা প্রয়োজন, তা হলো নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা। অন্যদিকে ৪০% উত্তরদাতা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে না রেখে বরং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই দেয়া উচিত। বাকি শতকরা ১০ ভাগ উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দায়িত্ব পালনে ৯০ দিনের স্থলে আরো ৩০ দিনের সময় বৃদ্ধি করে দেয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

(৮) স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত কি-না ঃ

আপনি কি মনে করেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত - এ প্রশ্নের উত্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণের অধিকাংশই (৮০%) মনে করেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে স্বল্পসংখ্যক (২০%) উত্তরদাতা মনে করেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হওয়া উচিত। কেননা স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব থেকেই যায়। সেখানেও গাঁয়ের জোরে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার ঘটনা ঘটে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার গ্রহনযোগ্যতা ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আপনি কতটা গ্রহনযোগ্য মনে করেন - এ সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের বেশীরভাগ উত্তরদাতা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবশ্যই একটি গ্রহনযোগ্য ব্যবস্থা। উত্তরদাতারা উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক অধিকাংশ দেশসমূহে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান না থাকার পরেও এদেশের জন্য এ ব্যবস্থাকে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। কারণ এ ব্যবস্থার অধীন ছাড়া নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মাত্র কিছুসংখ্যক উত্তরদাতা এ ব্যবস্থার গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

(১০) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানে সক্ষমতা ঃ

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানে সক্ষম হয়েছিল - এর উত্তরে ৬০% স্থানীয় প্রতিনিধি বলেন, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানে সক্ষম হয়েছিল। অপরপক্ষে ৩০% উত্তরদাতা বলেন ভিন্ন কথা। তাদের মতে, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণ তন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দানে ব্যর্থ হয়েছিল। আর শতকরা ১০ জন উত্তরদাতার উত্তরে পূর্বোক্ত উভয় মতের মিশ্রতা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

Conclusion

গণতন্ত্র যে কোন দেশের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা। গণতন্ত্র বালি মনন সম্পৃক্ত প্রণোদনা ও চেতনার নাম। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমাদের পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক আন্দোলনের অভিব্যক্তিই ছিল এ গণতন্ত্র। কাজেই ১৯৭২-এর সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম ছিল গণতন্ত্র। কিন্তু বাস্তবতা হলো অভিপ্রায় আর উদ্যোগ এক বিন্দুতে মেলে নি আজও; আর গণতন্ত্র আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

গণতন্ত্র অনেক সাধনার বিষয়। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে সর্বস্তরে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রায়নের পাটাতন তৈরি করে বেশ কিছু মৌল উপাদান, যেমন ঃ যথার্থ সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক কাঠামো সংবলিত রাজনৈতিক দল এবং আন্তঃদলীয় গণতান্ত্রিক আচরণবিধি। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনটিই আজ আমাদের নড়বড়ে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে স্পর্শ করে নি। অথচ যেসব দেশে গণতন্ত্র সফল হয়েছে, সেসব দেশে একটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। জনগণকে দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। এ দেশে এখনও গণ তন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয় নি অথবা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণের পথে হাঁটি- হাঁটি পা-পা করে এগোলেও বারবার হোঁচট খাচ্ছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি এ দেশে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ যথার্থই বলেছেন, "বিশ বছর আগে এমনি আবেগভরে জাতি সংসদীয় গণতন্ত্রের বন্ধুর পথে শুরু করেছিল গর্বিত পদভরে যাত্রা, তা কিন্তু লক্ষ্যের স্বর্ণতোরণ স্পর্শ করে নি। মাত্র ক'বছরে তার গতি হয় স্তব্ধ। অতীতের তিক্ত স্মৃতি নিয়েই তাই আমাদের পথ চলতে হবে। এ-ব্যবস্থার সাফল্য মূলত নির্ভর করে সরকারের সৃজনশীলতার ওপর। নির্ভর করে বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক চেতনার ওপর।"[১]

---

১. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র : প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা", ঢাকা, করিম বুক করপোরেশন, ১৯৯২, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র মাধ্যম হলো নিয়মিত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান। আর এরই ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চাকে সমুন্নত করার তাগিদে প্রবর্তিত হয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে এক নবতর সংযোজন।[২] নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের ন্যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে' বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি একটি নতুন ধারণা।

স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচনই রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাই নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা। 'কোন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ হতে পারে না' - এ যুক্তির ভিত্তিতেই বাংলাদেশে এ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের মানুষকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। মূলতঃ এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন ও গণদাবির ফসল।

বাংলাদেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন সুদীর্ঘ নয় বছর জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে বি.এন.পি. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে সেই বি.এন.পি. বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে অগ্রাহ্য করে। তারা এ দাবিকে 'অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক' বলে আখ্যায়িত করে। যে কারণে বিরোধী দলগুলোকে আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। ফলে ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক ভিত্তি লাভ করে।

---

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, সংশোধিত ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের স্বার্থেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে অতি প্রয়োজন। অতীতে বাংলাদেশে এমন অনেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা ছিল ভোট ডাকাতি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, মিডিয়া ক্যু, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ। এসব কারণে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনীহা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়ায় নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। ফলে নির্বাচনে অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহন করতে পারে। নির্বাচনে যাতে কোন প্রকার দুর্নীতি ও অনিয়ম না হয়, সে ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালের নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং গণতন্ত্র পূর্ণরূপে বিকাশ পেয়েছিল। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে অধিক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। এর আগে কোন নির্বাচন এতো স্বচ্ছ ও অবাধ হয় নি। বলাবাহুল্য দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সকল ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্লিপ্ত, নির্মোহ ও দল নিরপেক্ষ থেকে নির্বাচন কার্যক্রম সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধভাবে পরিচালনা করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ সাফল্য গণতন্ত্রকামী বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যাশা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আবশ্যিকতা শুধু বাংলাদেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই বিশ্বের অনেক দেশই এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Selected Bibliography

- ড. তারেক শামসুররেহমান, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।
- ড. তারেক শামসুর রেহমান, গণতন্ত্র সুশাসন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬।
- বিচারপতি লতিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা, ঢাকা, জুলাই, ২০০২।
- মাহমুদ শফিক, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অনন্যা প্রকাশনা, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৯৬।
- মিজানুর রহমান খান, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, সিটি প্রকাশনী, মার্চ, ১৯৯৫, ঢাকা।
- বি. বি. বিশ্বাস, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ঢাকা, নীলা পাবলিশার্স, জুলাই, ২০০১।
- বেবী মওদুদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৮৮ দিন, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।
- তারেক এম. টি. রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮।
- ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির গতিধারা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের সমস্যাবলী, ঝিনুক প্রকাশ, ২০০২।
- ড. এমাজউদ্দীন আহমদ সম্পাদনা, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৯২।
- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদনা, গণতন্ত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫।
- এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩।
- ড. হাসান উজ্জামান, ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ঃ একটি বিশ্লেষণ, আওয়ামী লীগ ও বাকশাল ১৯৭২-১৯৭৫, সিলেট, বাংলাদেশ প্রকাশনী, ১৯৮০।
- ড. হাসান উজ্জামান, নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, অক্ষর, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯২।
- দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান,তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টারপ্রাইজ, জুন, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭৬।
- শফিক রেহমান, গণতন্ত্র, জানুয়ারি, ১৯৯৯।
- ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তৃতীয় পত্র (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলাদেশের সংবিধান ও রাজনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

- হারুন - অর - রশিদ, বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ ১৮৬১-২০০১, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা।
- মোঃ মাকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা, রাজশাহী, বাংলাদেশ বুকস প্যাভিলিয়ন, জুন, ১৯৯০।
- মুহম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, ঢাকা, হাসান বুক হাউজ, ২০০১।
- সুরভী বন্দোপাধ্যায়, গবেষণা ঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি, কলকাতা, দে'জ পাবিলিশিং, জুলাই, ১৯৯০।
- মোঃ মাইনুল আহসান খান, সাংবিধানিক আইন, রাজনীতি, ধর্ম ও স্বাধীনতা, ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, জুলাই, ১৯৯৮।
- দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ, জুন, ১৯৯৪।
- সরদার ফজলুল করিম (অনুদিত), প্লেটোর রিপাবলিক, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ৭ম সংস্করণ, ২০০০।
- আনু মুহাম্মদ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ দুই দশক, ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী।
- সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তিঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, জুন, ২০০২।
- আমিনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা ,প্যাপিরাস প্রকাশনী।
- ইউনুস আলী দেওয়ান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা, পূর্বদেশ পাবলিকেশনস, অক্টোবর, ১৯৯১।
- অনাদি কুমার মহাপাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, ২০০২।
- মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, রিকো প্রিন্টার্স, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭।
- ড. মোঃ আদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯৯।
- ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ সংঘাত ও পরিবর্তন, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস লিঃ, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৪।
- ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউনষ্টোর্স, রংপুর, ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৮।
- ড. তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, গণতন্ত্র, কার্যকর সংসদ, সরকার ও বিরোধী দল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।
- জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, যখন তত্ত্বাবধাক সরকারে ছিলাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।
- ড. তারেক শামসুর রেহমান, গণতন্ত্রের শত্রু-মিত্র প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২।
- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সরকার, সংবিধান ও অধিকার, সময় প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

- ড. তারেক শামসুর রেহমান, বাংলাদেশ রাজনীতির এক দশক, গ্রন্থমেলা, ঢাকা, ২০০৩।
- আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নির্বাচিত কলাম ঃ ১ গণতন্ত্রের বিশ্বাস ও প্রয়োগ, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, মে, ২০০৩।
- মহিউদ্দিন খান মোহন, সমকালীন রাজনীতির চিত্র প্রতিচিত্র, শিকড়, ঢাকা, ২০০৩।
- মহিউদ্দিন খান মোহন, আবর্জনার রাজনীতি, রাজনীতির আবর্জনা, শুভ প্রকাশন, ঢাকা, ২৫ মে, ২০০৩।
- শেখ আবদুর রশীদ, যুগপরিক্রমায় বাংলাদেশের সংবিধান, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ২১ জুন, ১৯৯৪।
- মাহমুদ শফিক, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, বর্ণবীনা, ঢাকা, মে, ১৯৯৩।
- ড.এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
- এম.সাইফুল্লাহ্ ভূঁইয়া ও মোঃ ফয়সাল, নির্বাচন ও গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬।
- ড. হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশ ১৯৮৯-রাজনীতিক সংসটের স্বরূপ ও মৌল নীতিমালার ঐকমত্য, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা-৩৪, নভেম্বর, ১৯৮৯।
- ড. এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান, বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার, প্রকৃতি ও প্রত্যাশা, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা-৪৯, ১৯৯৩।
- Waresul Karim, Election Under a Caretaker Government An Empirical Analysis of the October 2001 Parliamentary Election in Bangladesh, Dhaka, The University Press, L.T.D., 2004.
- Nizam Ahmed, Non-Party Caretaker Government in Bangladesh Experience and Prospect, The University Press Limited, 2004.
- M. Nazrul Islam, Consolidating Asian Democracy, Dhaka, Nipun Printing Industries, 2003.
- Rounaq Jahan, Bangladesh : Problems and Issues, Dhaka, University Press Ltd., 1980.
- Moudud Ahmed, Democracy and the Challenge of Development, Dhaka, U.P.L., 1995.
- Dr. Fakhruddin Ahmed, The Caretakers : A First Hand Account of the Interim Government of Bangladesh (1990-91)..
- Mohammad A. Hakim, Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum, University Press Limited, Dhaka, 1993.
- George Modelski, Encyclopedia of Government and Politics.

Dhaka University Institutional Repository

- Samual P. Huntington, The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1991.
- Talukder Moniruzzaman, Radical Political and the Emergence of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh Book International Ltd., 1975.
- W. J. M. Mackenzie, Free Elections : An Elementary Text Book, London, 1964.
- H. Geoge Sabine, A History of Political Theory, New York, Henry Holt and Company, 1958.
- Douglas R. Berdie, and John F. Anderson, Questionnaries: design and Use, Mctuchen, N J, The Scare Crow Press, Inc., 1974.
- Peter W.M. John, Statistical Design and Analysis of Experiments, New York, The Macmillan Co., 1971.
- Hood Philips, Constitutional Law, Britain, Oxford Publishers, 1981.
- R. Sobhan, Problems of Governance in Bangladesh, Dhaka, U.P.L., 1993.
- Kamal Siddiqui, Towards Good Governance in Bangladesh, Dhaka, University Press Limited, 1996.
- M. Nazrul Islam, "Bangladesh" in J.C Johare et.al, Government and politics of South Asia, New Delhi: Sterling Publishers, 1991.
- M. Nazrul Islam, Parliamentary Democracy in Bangladesh: An Assessment, Perspectives in Social Science, Dhaka University, Center for Advanced Research in Social Science, Vol. 5, October, 1998.
- Robert Ross, Research : An Introduction, India, Chapter.1, 1988.
- Nizam Ahmed, "Bangladesh in Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook" Dieter Nohlen, Florian Grotz and Christ of Hartmann Eds. Vol.1.
- Seervai, Constitution Law of India, 2nd ed., Vol.3.
- S.G. Ahmed and M.M Khan, "Bangladesh", in V. Subramaniam, ed., Public Administration in the third world, Connecticut: Green Wood Press, 1990.
- Bartrand Russell, A History of Western Philosophy, London, Allen and Unwin, L.T.D., 1957.
- C.R. Kathari, Research Methodology, New Delhi, Wishwa Prokashan, 1985.
- Zillur R. Khan, Leadership, Parties and Politics in Bangladesh, Western Political Quarterly, Vol. 29, No. 2, March, 1976.
- A.M.A. Muhith, A Riggd Election : An Illegitimate Government, Center for Research and Information (CRI), Dhaka, 2002.

Dhaka University Institutional Repository

- Karl Loewenstein, British Cabinet Government, Oxford University Press, New York, 1967, P. 1X.
- Riddell, The Canadian Constitution in From and Fact, Canada, Place Publishes, 1923
- Mari Harris, Attitudes and Behaviour of the New South African Electorate : An Empirical Assessment, International Social Science Journal, 47 (4), December, 1999.
- M.S. Alam and N. Ahmed, Good Governance in Bangladesh, Annual Report, Dhaka: Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), 1994.
- Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, University Press Limited, 1998.
- Marry E. Macdonald , Social Work Research : A Perspective, Norman A. Polanasky (ed.), 1960.
- Robertson David, The Penguin Dictionary of Politics, Middlesex, England, Penguin Books Ltd., 1987.
- W. F.Willoughby, Government of the Modern States.
- Ivor Jennings, Cabinet Government, 3rd Ed., Cambridge University Press, 1969.
- Durgadas Basu, Commentary on the Constitution of India, Vol. E, 1981.
- Dr. Ataur Rahman, Challenges of Governance in Bangladesh, BIISS Journal, Dhaka, Bangladesh Institute of International and Strategic Stadies, Vol. 14, No. 4, October, 1993.
- Arun Kumer Goswami, The Grits of Democratization in Bangladesh, Bangladesh Political Science Review, Vol. 1, No. 1, June, 2001.
- Dr. Ataur Rahman, Democratization in South Asia : Bangladesh Perspectives, Bangladesh Political Science Review, Vol. 1, No. 1, June, 2001.
- Governance and Electoral Process in Bangladesh, Parliamentary Election 1996, Report of SAARC-NGO Observers.
- What is Democracy? United State Information Agency Publication, October, 1991.

Dhaka University Institutional Repository

দলিলাদি
Documents

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, সংশোধিত-২০০১।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৪, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ-বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯১।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচনী আচরণ বিধি, ১৯৯৬।
- বাংলাদেশ বিশ্বকোষ, বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকাসমূহ
Daily Newspapers

- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মার্চ, ১৯৯৬।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ, ১৯৯৪।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ জুন, ১৯৯৪।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জুন, ১৯৯৪।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১ আগস্ট, ১৯৯৫।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুন, ১৯৯৬।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জুন, ১৯৯৬।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১ এপ্রিল, ১৯৯৬।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ২৭ মার্চ, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ৫ মে, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ৩০ জুন, ১৯৯৪।
- দৈনিক সংবাদ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৫।
- দৈনিক সংবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০।
- দৈনিক সংবাদ, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ২১ এপ্রিল ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ, ১৯৯১।
- দৈনিক সংবাদ, ৭ এপ্রিল, ১৯৯৬ ।
- দৈনিক সংবাদ, ২৪ জুন, ১৯৯৬।
- দৈনিক সংবাদ, ৫ এপ্রিল, ১৯৯৬,
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ জুন, ১৯৯৬।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ, ১৯৯১।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর, ১৯৯৫।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

- দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ জুলাই ২০০৩।
- দৈনিক ইনকিলাব, ২১ মার্চ, ১৯৯৪।
- দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।
- দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।
- দৈনিক সংগ্রাম, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০।
- দৈনিক লালসবুজ, ১০ এপ্রিল, ১৯৯৬।
- The Daily Star, 30 March, 1996.
- The Daily Star, 4 November, 2001.
- The Independent, 7 September, 2001.
- The Daily Star, 14 October, 2001.
- The Independent, 11 October, 2001.
- The Bangladesh Observer, 15 June, 1996.
- The Bangladesh Observer, 12 June, 1996.
- The Bangladesh Observer, 20 June, 1996.
- The Bangladesh Observer, 28 March, 1996.
- The Daily Star, 21 November, 1994.
- The New Nation, 8 May, 1986.
- The Bangladesh Times, 2 March, 1991.

সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ
Weekly Newspapers

- সাপ্তাহিক বিচিত্রা
- সাপ্তাহিক রোববার
- সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা
- সাপ্তাহিক খবরের কাগজ
- সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা
- সাপ্তাহিক ২০০০
- সাপ্তাহিক যায় যায় দিন
- Weekly Holiday
- Weekly Dhaka Courier
- Probe, News Magazine

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

(এম.ফিল কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

জনসাধারণের মতামত জরিপ প্রশ্নপত্র

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ	তারিখ ঃ
তথ্য সংগ্রাহকের নাম ঃ	
তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ	স্বাক্ষর ঃ

(ক) সাক্ষাৎদাতার পরিচিতি

১. নাম ঃ	২. বয়স ঃ
৩. পেশা ঃ	৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা

(খ) আপনার মতামত প্রদান করুন –

(১) বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কি কি বাঁধা রয়েছে?

(২) সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আপনার মতে কোন বিষয়টি বেশী জরুরি?

(৩) নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন প্রভাব রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের উপর কোন প্রভাব ফেলে কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রভাব .....

(৫) নির্বাচনে ভোট প্রদানে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? হাঁ/না।

(৬) এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা উদ্ভবের কারণ কি?

(৭) আপনার মতে এদেশে কোন কোন নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত? জাতীয় সংসদ/স্থানীয় সরকার/উভয়টাই /কোনটাই না।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কিভাবে .....

না হলে কেন .....

(৯) দুই সরকারের সময়ে ভোট প্রদানে কোন পার্থক্য রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কোন ধরনের পার্থক্য .....

(১০) সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কিছু হতে পারে কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি? .....

(১১) আপনার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের মূল সুবিধাসমূহ কি কি?

(১২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব পালনে কতটা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করেন বলে আপনি মনে করেন? পুরোপুরি/আংশিক/একেবারেই নয়।

(১৩) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ কি কি?

(১৪) আপনি কি মনে করেন ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষম হয়েছিল? হ্যাঁ/না।

(১৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে –

ক. দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে উন্নত/ মোটামুটি/ একই থাকে/ অধঃপতন ঘটে।

খ. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পুরোপুরি উন্নতি ঘটে/ আংশিক উন্নতি ঘটে/ একই থাকে/ অবনতি ঘটে।

গ. নির্বাচন কমিশন অধিক স্বাধীনভাবে কাজ করে/ আংশিক স্বাধীনভাবে কাজ করে/ একই রকম কাজ করে/ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

ঘ. পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে / আংশিক নিরপেক্ষভাবে কাজ করে/ একই রকম থাকে/ নিরপেক্ষতা হারায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

(এম.ফিল কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

সংবিধান বা আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
বয়স ঃ	বর্তমান পদবী ঃ

(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণ কি?

(২) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনোনীত ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

(৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌল নীতি '১১ অনুচ্ছেদ'- এর সাথে কতটা সাঞ্জস্যর্পূণ বলে আপনি মনে করেন?

(৪) আপনার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা নিয়োগ বা গঠন প্রক্রিয়া কি সঠিক? এর কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের .....

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন পক্ষপাতিত্বের বা দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত বা প্রমাণিত হয় তাহলে আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহনের সুযোগ রয়েছে কি?

(৬) আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষ মনে করেন কি? হ্যাঁ/না।

না হলে কেন .....

(৭) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর জন্য গণভোটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

(৮) আইনগতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের উপর কতটা নিয়ন্ত্রন আরোপ করতে পারে?

(৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর থাকে কি? হ্যাঁ/না।

(১০) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে ভূমিকা রাখতে পেরেছিল? হ্যাঁ/না।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

(এম.ফিল কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
বয়স ঃ	বর্তমান পদবী ঃ

(১) আপনার মতে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা জরুরি?

(২) বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি জন্ম হবার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

(৩) উন্নত বিশ্বে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব হলেও বাংলাদেশে নয় কেন?

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা? আপনার অভিমত দিন।

(৫) আপনি কি মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে যথেষ্ট? হ্যাঁ/না।

না হলে আপনার পরামর্শ .....

(৬) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী কতটুকু গণতন্ত্রসম্মত?

(৭) আপনার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কার হাতে থাকা উচিত?

(৮) একটি স্বীকৃত মডেল হিসেবে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

(৯) আপনার মতে ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য কি?

(১০) আপনার মতে ১৯৯৬ সালের বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করতে কি ভূমিকা পালন করেছিল?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

(এম.ফিল কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকাকালীন পদবী ঃ	
বয়স ঃ	বর্তমান পদবী ঃ

(১) নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

(২) আপনি কি মনে করেন প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণ আস্থা হারাতে বসেছিল বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণার জন্ম? হ্যাঁ/না।

(৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন আয়োজনের জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা কি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত? হ্যাঁ/না।

না হলে আপনার পরামর্শ .....

(৪) নির্বাচনী অনিয়ম ও দূর্নীতি দূরীকরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা কতটুকু আইনসম্মত?

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের ম্যান্ডেট রয়েছে কি?

(৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসূকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

(৭) আপনার মতে এদেশে কোন কোন নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত?

(৮) তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকাকালীন সময়ে আপনাদেরকে দায়িত্ব পালনে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

(৯) নির্বাচন কমিশনের উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ কতটা ছিল?

(১০) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সমুন্নত করতে কি ভূমিকা রেখেছিল?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

(এম.ফিল কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

মন্ত্রিপরিষদ সদস্য বা সাংসদ বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
রাজনৈতিক পদবী ঃ	
বয়স ঃ	বর্তমান পদবী ঃ

(১) নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এদেশে বাঁধাসমূহ কি কি?

(২) দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কিভাবে .....

না হলে কেন নয় .....

(৩) বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভবের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানের লংঘন কি না? মন্তব্য করুন।

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব কি হওয়া উচিত?

(৬) সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না কি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন?

(৭) অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন –তাত্ত্বিক দিক থেকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

(৮) আপনার মতে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কিছু হতে পারে কি?

(৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কার হাতে থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

(১০) আপনি কি মনে করেন ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছিল?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নঃ ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

(এম.ফিল কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরনার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
বয়স ঃ	পদবী ঃ

(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

(২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন এবং দেশ পরিচালনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

(৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচনের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ে কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের .....

(৪) বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর অধীনে নির্বাচন আয়োজনের কোন রূপ আবশ্যকতা রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কেন .....

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার দায়িত্ব পালনে কতটা স্বাধীন বলে আপনি মনে করেন?

(৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নির্দিষ্ট ৯০ দিনের সময়সীমা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য কি পর্যাপ্ত? হ্যাঁ/না।

না হলে কেন .....

(৭) আপনার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে কিভাবে আরো শক্তিশালী করা যায়?

(৮) আপনি কি মনে করেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত? মন্তব্যাখ্যা করুন।

(৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আপনি কতটা গ্রহনযোগ্য মনে করেন?

(১০) ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি গণ তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দানে সক্ষম হয়েছিল?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের একাদশ সংশোধনী

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ - ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, আগষ্ট ১০, ১৯৯১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ই আগষ্ট, ১৯৯১ / ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৯৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ই আগষ্ট, ১৯৯১ (২৫শে শ্রাবণ, ১৩৯৮) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

১৯৯১ সনের ২৪ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক সরকার অপসারণ করিয়া একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে বাধ্য হন ;

এবং যেহেতু দলমত-নির্বিশেষে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবি সংগঠন, প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল ও সর্বস্তরের জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর তিনটি প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্মদকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানান ;

এবং যেহেতু তদানীন্তন উপ-রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্য পদে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্মদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন ;

এবং যেহেতু গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে সরকার পরিচালনার পর প্রধান বিচারপতি হিসাবে স্বীয় পদে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন এই মর্মে দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক জোটের ও দলের দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতিতে সাড়া দিয়া প্রধান বিচারপতি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মহতী উদ্দেশ্যে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিরপেক্ষ সরকার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহন করেন ;

এবং যেহেতু প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্মদের উপ-রাষ্ট্রপতি তথা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পরিচালনাকালে দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের লইয়া জাতীয় সংসদ ও জনগণের সরকার গঠিত হইয়াছে ;

Dhaka University Institutional Repository

এবং যেহেতু উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং তৎকর্তৃক প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং কৃত ও গৃহীত সকল কাজকর্ম ও ব্যবস্থা অনুমোদন ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে এবং জনগণ ও প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দলগুলির প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রধান বিচারপতি পদে তাঁহার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিধান করার লক্ষ্যে সংবিধানের সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।-এই আইন সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২০ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ২১ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

"২১। উপ-রাষ্ট্রপতির নিয়োগ, অনুমোদন ও সমর্থন ইত্যাদি।-

(১) ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং তাহার নিকট পদত্যাগ প্রদান এবং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) এর প্রবর্তনের তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে বা ২১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নূতন রাষ্ট্রপতি বিবেচিত হইয়া কার্যভার গ্রহন করা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে (যাহাই পরে হউক) উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত অথবা প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত বলিয়া বিবেচিত সকল আদেশ, সকল কাজকর্ম এবং সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

(২) সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান মোতাবেক নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণের পর উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহন করিতে পারিবেন এবং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে তাঁহার উক্ত কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণের তারিখের মধ্যবর্তী সময় Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance, 1982 (Ordinance N0. XX of 1982) এর section 2 (a) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রকৃত কর্ম (actual service) বলিয়া গণ্য হইবে।"

আবুল হাশেম
সচিব

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মূদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মূদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ - ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৮, ১৯৯৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬ / ১৪ই চৈত্র, ১৪০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬ (১৪ই চৈত্র, ১৪০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

১৯৯৬ সনের ১ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিতকর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।- এই আইন সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংবিধানে নতুন ৫৮ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলিয়া উল্লেখিত) এর ৫৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"৫৮ক। পরিচ্ছেদের প্রয়োগ।-এই পরিচ্ছেদের কোন কিছু ৫৫ (৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী ব্যতীত, যে মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ অবস্থায় থাকে সেই মেয়াদে প্রযুক্ত হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ২ক পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে ৭২ (৪) অনুচ্ছেদের অধীন কোন ভংগ হইয়া যাওয়া সংসদকে পুনরাহ্বান করা হয় সেক্ষেত্রে এই পরিচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে।"

৩। সংবিধানে নতুন ২ক পরিচ্ছেদের সন্নিবেশ।-সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নতুন পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"২ক পরিচ্ছেদ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার"

৫৮খ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।-

Dhaka University Institutional Repository

(১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহন করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহন করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপ্রতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ (১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪) ৫৫ (৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

৫৮গ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ইত্যাদি।-

(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্টপ্রতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত

আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানাবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহন করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি-

(ক) সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ;

(খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন ;

(গ) সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন, এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন;

(ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নতুন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহন করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

৫৮ঘ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী।-

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন ; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫৮ঙ। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকরিতা।-এই সংবিধানের ৪৮ (৩), ১৪১ক (১) এবং ১৪১গ (১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, ৫৮খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহনান্তে কার্য করার বিধানসমূহ অকার্যকর হইবে।"

৪। সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের সংশোধন।-সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের "নিয়ন্ত্রিত হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিলিত হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন।-সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের (১) দফায় "আধা-বিচার বিভাগীয় পদ" শব্দগুলির পরিবর্তে "আধা-বিচার বিভাগীয় পদ অথবা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।-সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(৩) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।"

৭। সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।-সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফায়,–

(ক) (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(খ) প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা," এবং

(খ) (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(ঘ) মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী,"।

৮। সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।-সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায়,–

(ক) "অনুচ্ছেদ" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"উপদেষ্টা" অর্থ ৫৮গ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ;

(খ) "প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"প্রধান উপদেষ্টা" অর্থ ৫৮গ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি।

৯। সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।-

(১) সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের ফরম ১ এর পর নিম্নরূপ ফরম ১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"১ক। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে।- প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবেঃ

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি, ... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ত তার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

Dhaka University Institutional Repository

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি, ... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা য সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধান উপদেষ্টা রূপে যথাযথভাবে আমার বর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।"

(২) সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের ফরম ২ এর পর নিম্নরূপ ফরম ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"২ক। প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি, ... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব; এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

(খ) গোপনীয়তার শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি ..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।"

আবুল হাশেম

সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মূদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মূদ্রিত।
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।